লেখক, অনুবাদক ও সংকলক

শ্রী চণ্ডিদাস ভট্টাচার্য্য।

তপোভূমি

নৈমিষারণ্য

শ্রী চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
লিখিত, অনুবাদিত ও সংকলিত।

TAPABHUMI-NAIMISHARANYA

প্রথম প্রকাশ কাল ঃ ১২ই জুন, ২০১০

প্রকাশক ঃ-

শ্রীমতী পর্ণা ভৌমিক

"রিজেন্ট পার্ক"

পোঃ রহড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

কোলকাতা-৭০০১১৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

দাস বুক স্টল

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

(দেব লাইব্রেরীর বিপরীতে)

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী ভোলানাথ বক্সী।

মূল্য ঃ একশত কুড়ি টাকা মাত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলী

পূজ্যপাদ, মহামহোপাধ্যায়— গোপীনাথ কবিরাজ মনীষির উদ্দেশ্যে—

"আপনার মহাকরুণায়, সমবেত প্রচেষ্টায়, অপ্রকাশিত প্রাচীন তপস্যার কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।"— তাই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি আপনাকেই উৎসর্গিত করা হলো।

চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস ১২ই জুন, ২০১০।

ওঁ সূচীপত্র ॐ

প্রাক কথন

কলকাতার হাওড়া রেলষ্টেশন থেকে বেলা ১১টা-৩০মিনিটে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে চেপে পরদিন রাত্রি প্রায় ১১টা-৩০মিনিটে হরদৈ স্টেশনে নামলাম। ওখান থেকে রিক্সায় চেপে হরদৈ-এর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে, হরদৈ থেকে নৈমিষারণ্যগামী বাসে বসে পড়লাম। সবে পাকা রাস্তা তৈরী হচ্ছে, মাঝে-মাঝে মাটির পথ, তারপর আবারও পাকা রাস্তা, ক্রমান্বয়ে এভাবে চলার পর, মাঝপথ অতিক্রম করার পূর্বেই সার্ভিস বাসের কন্‌ডাকটর আমাদের কাছ থেকে জন-প্রতি ছয় টাকা করে আদায় করলো। আমরা যথা সময়ে গাড়ী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিঃশ্চিন্তে গ্রামপল্লীর দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্যই হলাম, এ-স্থানটী এতো প্রাচীন স্থান তবুও কোনও বিশেষ উন্নতিই চোখে পড়ল না।

নৈমিষারণ্য থেকে প্রায় দু-মাইল দূরে পথের মাঝে আমাদের বাসের কন্‌ডাকটর নৈমিষারণ্য গামী সবাইকেই নামিয়ে দিল এবং বললো নৈমিষারণ্যতে ভীষন ভীড় সেজন্য বাস ঘুড়িয়ে সীতাপুর নিয়ে যাবে। তারপর আমরা অনেকেই মালবাহী - রিক্সাতে চেপে মালপত্র নিয়ে গৌড়ীর মঠে উপস্থিত হলাম। দু'মাস পূর্ব্বে ঐ মঠে থাকার জন্য বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম।

পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমাকাশে তু পুষ্করম।
চক্রতীর্থ তু মহাবাহো পাতালতলে বিদুঃ ।।

শুধু ভারতবর্ষেই নয়,সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের পবিত্রতম তীর্থ এই নৈমিষারণ্য। সর্ব-প্রকার তাপ-পাপহারী সাধক-সিদ্ধিকারী অসংখ্য মুনিঋষিগণের তপোভূমি, জনাকীর্ণ, সকলতীর্থ-সেবিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশাদির ও জগজ্জননী-জগদম্বা, ললিতাদেবীর(ত্রিপুরাসুন্দরী) দ্বারা সংরক্ষিত এবং সুপূজিত চক্রতীর্থের জল আজও দৃষ্টিগোচর এবং নানাপ্রকার সুফল প্রসব করছে।

ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, অনৈকতা থেকে একতা, খন্ড থেকে অখন্ডতাতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পবিত্রতম তপোভূমি। ধার্মিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। আদিকাল হ'তে বর্তমানেও জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভিতরের সমস্তপ্রকার অন্ধকার আবরণ দূর করে, মানব কল্যাণের জন্য জ্ঞান-যজ্ঞ করে চলেছেন।

সত্যবতীর গর্ভে - পরাশর মুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করে বেদব্যাস এখানেই বেদের বিভাজন করে, বেদব্যাস নামে পরিচিত হয়েছিলেন । এই ভূমিতেই ১৮টি পুরাণ, ১৮টি সহ-পুরাণ এবং ১৮টি উপ-পুরাণ লিখিত হয়েছিল । উপরন্তু শ্রীমদ-ভাগবত পুরাণ এখানেতেই সর্বপ্রথম প্রচার হয় । সূত-গোস্বামীজি শ্রীমদ-ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন এবং এ অঞ্চলের মুনি-ঋষিগণ তা শ্রবণ করে নিজেদের জীবন ধন্য করে ছিলেন ।

নৈমিষারণ্য শুধুমাত্র অরণ্য-ই নয়, এখানকার নগরীয় সভ্যতার অবশেষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে । এতো সর্বজনবিদিত যে, অতি প্রাচীন কালেতে ঋষি,মুনি,মহর্ষিদের তপোভূমি ছিল এই নৈমিষারণ্য । তারপর এই ভূমির নানাদিকে সুখ সুবিধা থাকায়, আকৃষ্ট হয়ে এখানে ক্রমে ক্রমে লোক বসতি গড়ে উঠলো এবং স্থায়ীভাবে এখানকার বাসিন্দারূপে থেকে গেল । এখানে যত্রতত্র মৌর্য কালীন সংস্কৃতির চিহ্ন দেখা যায় -- যেমন, এখানে খননকার্য্যের শেষে নানা প্রকার পোড়ামাটির বাসন, মাটির তৈরী নৈপুণ্যসম্পন্ন মুর্ত্তিসকল তাতে সন্দেহ নেই এবং এতে এখানকার প্রাচীনতার নিদর্শন ব্যক্ত হচ্ছে ।

এই নগরীয় সভ্যতা বিশাল এলাকা জুড়ে --গোমতী নদীর উত্তর দিক হতে বাম দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে ৫২টি মহল্লা ছিল বলে কিংবদন্তী আছে । কুষাণ-বংশ নগরীয় সভ্যতায় পরিপুর্ণ ছিল ।পান্ডবগণের দুর্গ বিখ্যাত স্থানে আজও দেখা যায়, যা প্রাচীন পাথরের তৈরী বিরাট দ্বার-দেশ (প্রবেশ দ্বার) তার ভিতরে পাথরের বিশাল মন্দির ছিল, (বর্তমানে মাতা আনন্দময়ীর - পুরাণমন্দির নবনির্মিতরূপে শোভা পাচ্ছে)। যে প্রাচীন পাথরের বিরাট খন্ডটি আজও দেখতে পাওয়া যায়, উহার তলদেশ মাটীর অতি গভীর পর্য্যন্ত,ওখানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড লাগানো আছে । এই পাষাণ ফলকের উপর নানাপ্রকারের মূর্ত্তি বানানো আছে,তাহা প্রাচীনত্ত্ব শিল্পনৈপুণ্যের জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ ঐতিহ্যমন্ডিত বলা যায় ।

আদি রাজা মনু, রানী শতরূপা এখানে তীব্র তপস্যার দ্বারা আদি অনাদি - অনন্ত অখন্ড,অচ্ছেদ্য অভেদ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে দ্রবীভূত করে, রূপান্তর ঘটিয়ে সগুণ স্বরূপে অবতরণ করতে বাধ্য করেছিলেন । সেজন্যই শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ-পরশুরাম প্রভৃতি অবতার পুরুষগণের অবতরণ হয়েছিল । এদের অবতরণের জন্যই অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকাদি,মাহাত্ম্যপূর্ন ভূমিরূপে প্রসাদ বলে আজও স্বীকৃত ।

পরোপকার করার জন্য আত্মোৎসর্গের বিরল উদাহরণরূপে মহর্ষি দধীচির আত্মদান এক ঐতিহ্যমন্ডিত সাক্ষীরূপে আজও মিশ্রিত নামে অলংকৃত হয়ে আছে। ওখানে যে কূন্ডটি রয়েছে তাতে সকলতীর্থের জল আজও বিদ্যমান। ঐ জলকে আত্মসাৎ করে সব তীর্থকে আহ্বাণ করা হয়েছিল,মার্কন্ড মুনির দ্বারা সরস্বতী নদী এবং কশ্যপমুনির দ্বারা নিয়ে আসা কাশ্যপীগঙ্গা আজও অলংকৃত করছে। রুদ্রাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত যেমন পবিত্র, তেমনি সর্বসিদ্ধিদাত্রী গোমতী নদীর স্বচ্ছ জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। গোমতী নদীর তীরে রুদ্রাবর্ত্ত নামে এবং বিষ্ণুবর্ত এখনও প্রসিদ্ধ, সেখানে শিবের মাথায় ওঁ নমঃ শিবায় বলে বেলের পাতা দিলে এখনও বম্ -বম্ শব্দ শোনা যায় (প্রতি-ধধনি ওঠে)।

এ ভূমি প্রাচীন ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা এককালে সমৃদ্ধতা লাভ করেছিল,এমনকি এখানকার পবিত্রতা দেখে রাজা মান্ধাতা যজ্ঞ করেছিলেন, এখানকার সমৃদ্ধতা দেখে শ্রীরামচন্দ্র কয়েকবার নিজে লৌকিক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করে প্রাসাদের সুখ ভূলে গিয়ে বৈরাগ্যসম্পন্ন হন। পান্ডবগণও এখানে এসে লোকোত্তর আনন্দ প্রাপ্তি এবং বিধি অনুসারে স্নান-দান করে তৃপ্ত হয়ে ছিলেন। ভক্তপ্রহ্লাদ এই দিব্য ভূমির কথা গুরুমুখ শূক্রাচার্য্যে-র কাছ থেকে শুনে এখানে আসার জন্য বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন "পৃথিবায়াম নৈমিষ পুণ্যম্" - এই আপ্ত-বাক্য শুনে সমস্ত অনুগামীগণকে নিয়ে নৈমিষারণ্য পরিক্রমাতে অশেষ শান্তিলাভ করেন এবং জীবন সার্থক করেন। এখানেই বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে দর্শন করে দিব্য জীবন লাভ করে - জীবন সার্থক করেছিলেন।

এই দিব্য ভূমিতেই - বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বাক্যযুদ্ধতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সনাতন ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ শৌনিক মহামুনি এখানেই বাস করতেন। রাজা পুরুরতা, ধনলোলুপতা ও রূপতৃষ্ণায় একসময় নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি এখানে এসে মুনি-ঋষিগণের দ্বারা দিব্য-জীবন লাভ করে বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হলকর্ষণ বলরাম তীর্থযাত্রা নিমিত্তে এখানে এসে সূত গোস্বামীকে বধ করে ঘৃণিত হয়ে নিজেই নিজেকে অন্যায় ও পাতকরূপে ভাবনা করার কাহিনী এই নৈমিষ্যারণ্য দিব্যভূমিতে হয়েছিল। তথাপি এই দিব্য-ভূমি অতীতকাল হতে সকলতীর্থসেবিত এবং ভারতীয় শিক্ষা-জ্ঞানের চরম ও পরম বিন্দুরূপে আজও কেন্দ্রবিন্দুরূপে পূজিত।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ নামে গ্রন্থটি এখানেই-লিখেছিলেন ।তুলসীদাসজী রামচরিত মানস রচনার সময় নৈমিষারণ্যের কথা বার বার প্রকাশ করেছেন । মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এই পবিত্রভূমিতে মন্দির স্থাপন করে কীর্ত্তি রেখে গেছেন ।১৫-শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্য এসে ধর্ম বিষয়ক সৎসঙ্গ ও প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন ।

১৯৭৪ সালে যখন এখানে প্রথম আসি,তখন থেকেই এ-ভূমির প্রতি ভিতর থেকেই একটা অনুভূতি ও আকর্ষণ বোধ হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে ৮ বার এই নৈমিষ্ তপোভূমিতে আসার সৌভাগ্য হয় । এমনকি, ১৯৮২ সালে পুনঃরায় যখন আসি তখন এই নৈমিষারণ্য তপোভূমি সম্বন্ধে একটি বই লিখ্‌বো স্থির করি,এবং উপরোক্ত সাল থেকেই বই লেখার কাজ শুরু করে দিই ও বইয়ের অনেক অংশই লিখে ফেলি । সেজন্য নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ (১৬৮ মাইল) পায়ে-হেঁটে পরিক্রমাতে দু'বার যোগ দেই ।

নৈমিষারণ্য সম্বন্ধে কোনও বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই । রহড়া রিজেন্ট পার্কের - শ্রী সম্বিত ভৌমিক ও পূর্ণা ভৌমিকের প্রেরণায় ও বারংবার অনুরোধে এবং কল্যাণ নগরের শ্রী অপূর্বদেব মজুমদারের পরামর্শে লিখিত বইটি "যন্ত্রস্থ " করতে দিই । ওদের ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতা না পেলে এই বই প্রকাশিত হ'তো কিনা সন্দেহ ছিল ।

বিনীত ————

শ্রী চন্ডীদাস ভট্টাচার্য্য
কল্যাণ নগর ,
কোলকাতা- ১১২

ইং - ২০১০,
১২-ই জুন

নৈমিষারণ্যের ইতিহাস

সমস্ত ভারতবর্ষেই তীর্থ আছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক অবধি এবং উত্তর ভারত হ'তে দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত। সমস্ত জায়গার কোণে কোণে পবিত্রতা এবং আপন গরিমা রক্ষা করে চলেছে। এ দেশের মাটী সূর্যের প্রভায় পরিপূর্ণ। ঋষি-মুনি ও তপস্বিদের তপ-প্রভাবে প্রত্যেক জায়গা চমৎকৃত ও দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। সেজন্য সমস্ত ভারত চিন্ময় ভূমি হয়ে যাওয়াতে যে কোনো স্থানে বসে ভগবানের আরাধনা করলে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব ছিল। ভারতভূমি ভগবানের অতি প্রিয়ভূমি তাতে কোনো সন্দেহ হতে পারে না —কারণ, এখানে অনেক অবতার-পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের এটাই গর্ব যে,স্বর্গের দেবতাগণ ওখানকার স্বর্গসুখ ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন ধামেতে জন্মগ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

ভারত কর্মভূমি, ধর্মভূমি ও জ্ঞানভূমিও বলা চলে। মানুষ ইহলোকের কর্ম হতে পারলৌকিক সুখের জন্য নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম করে থাকে। এখানে জন্ম গ্রহণ করে ভারতবাসী ধন্য এবং জন্ম সার্থক হচ্ছে যে, ভারতমাতার কোলে পালিত হয়ে,সৌভাগ্যবান হয়েছে। এখানেই মর্য্যাদা সম্পন্ন পুরুষোত্তম শ্রীরাঘব পূর্ণকলাবতার ধর্মরাজ্যের সাক্ষী বহন করে চলেছেন। উপরন্তু,সাধুদের পবিত্রাণ এবং দুষ্টদের দমনের জন্য অবতীর্ন হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণকলাবতার তেমনি অর্জুনকে কর্ম বিরতি থেকে কর্মে প্রবৃত্তি — গীতা জ্ঞানের দ্বারাই করে-ছিলেন।

বুদ্ধ যেমন লোকেদের সংসারের উপদেশ দিতেন, তেমনি ঋষি-মুনি-তপস্বীগণ মানব সমাজকে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যপথে চলার নির্দ্দেশ এইভূমি থেকে প্রচার করতেন। স্কন্দপুরাণে ভারতকে সমস্ত দেশ হতে উত্তম বলা হয়েছে।কারণ, এই ভারত ভূমিতেই মহান ব্রতচারণ করার জন্য মুনিগণ সতত তপস্যায় রয়েছিলেন।

এখানেই সময় সময় অদ্বিতীয় বিভূতি সমূহের আবির্ভাব হতো। ঐ বিভূতির দ্বারা জপ-তপ ও ন্যায় এবং ধর্মের দ্বারা ঐ বিশেষ ক্ষেত্রকে পবিত্র ও মহিমান্বিত বানাতো। সাথে সাথে ধুমধাম করে সর্বত্র নিজেদের তপঃশক্তিতে সাধনার কিরণে দীপ্তি প্রদান করতো। তাঁদের অধ্যাত্মজ্ঞান, আত্মপ্রকাশ বাড়িয়ে জগতকে প্রকাশিত

বা জাগ্রত করে তুলতো । যেখানে তাঁদের জ্ঞানপ্রকাশ হতো সেখানেই তীর্থ ও তপোভূমি হয়ে যেত । তীর্থগুলি লোককল্যাণের জন্য এবং মনের শান্তির উদ্দ্যেশে, যাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি ও আনন্দ লাভ হয় । স্কন্দ-পুরাণের রেবাখন্ডতে এইপ্রকার উল্লেখ করা হয়েছে ।

উষরের তাৎপর্য এই যে, -- যে প্রকারে উষরেতে ফেলা বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার এখানে কৃত কর্ম-ফলের প্রারব্ধ মাত্রের কর্ম-ফল, ভোগের জন্য শুধু থাকে ।

ভারতের অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারকাপুরী মোক্ষদায়ক বলে বিখ্যাত । সৈন্ধবারণ্য, দন্ডকারন্য, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পবিত্র অরণ্য প্রসিদ্ধ । যেখানে মৃত্যু হলে, মুক্তির সাধন বলে পরিগণিত হয় । মনের সংযত ভাব খুবই তাড়াতাড়ি হয়, --সেজন্য মুনি ও তপস্বীগণ সেখানে বাস করে থাকেন । জাগতিক, বৈজ্ঞানিক বল যত বাড়ছে আমাদের দৈহিক বল ততটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । কামনা-বাসনা ও চাহিদার জন্য মানবকুল নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত এবং অশান্ত হওয়ার দরুণ, শান্তি ও আনন্দ পাওয়ার জন্য, সেইরূপ মানুষের অধ্যাত্মিক ভাবনা ও চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে । এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, যে পর্য্যন্ত সৃষ্টির ক্রম চলতে থাকবে, ধর্ম-স্থানের প্রতি এবং ধর্ম-ভাবনার প্রতি ব্যাকুলতা বাড়তে থাকবে ।

এই নৈমিষারণ্যতে ভাবনার প্রকাশ ও ভাবনার বিকাশ বৈদিক কাল থেকে আজ পর্য্যান্ত অক্ষুন্নই রয়ে গেছে । পুরাণ, ইতিহাস ও বৈদিক সাহিত্যে বিশদভাবে নৈমিষারণ্যের নাম উল্লেখ আছে । বৈদিককালীন সংহিতা এবং ব্রহ্মানেতে নৈমিষ নাম মেলে । সামবিধান ব্রহ্মানেতে নৈমিষারণ্যের কথা পাওয়া যায় । সায়ণাচার্য্যের অনেক ভাষ্যতে এইস্থানের কথা লেখা হয়েছে । বেদাঙ্গ শ্রৌতসূত্রতেও নৈমিষারণ্যের নাম অপরিচিত ছিল না ।

নৈমিষারণ্য সভ্যতা

ইতিহাসের পাতায় প্রাচীন সভ্যতার গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, বর্তমান কালেও তার গুরুত্ব আছে । সাধারনতঃ আমরা সিন্দুসভ্যতা, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো

সভ্যতাকেই প্রাচীন বলে থাকি । নৈমিষারণ্যের সভ্যতা সিন্ধু অববাহিকার হরপ্পা -মহেঞ্জোদাড়ো অপেক্ষাও প্রাচীন । বিরাট স্তুপগুলি বর্তমানেও দেখতে পাওয়া যায় । এ অঞ্চলের প্রায় হাজার স্তুপ আছে, মাটি খুঁড়ে একটু লক্ষ্য করলে নানা জায়গাতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় । অনেক স্তুপের উপর পুনঃপুনঃ সংস্কারাদি হয়েছে বা মঠ-মন্দিরাদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

আবার অনেক স্তুপের উপর এখনও কোন কিছুই হয়নি - যেমন হত্যাহরণ অঞ্চলে, গিরিধরপুর অঞ্চলে এবং নৈমিষারণ্য প্রভৃতিতে । প্রাচীন আচার-ব্যবহার, কর্মকান্ড, জ্ঞানকান্ড আজও লক্ষ্যনীয় । এর জন্য সাধন বিশেষ প্রয়োজন । এ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এবং এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করলেই, কিছুটা আভাষ পাওয়া যায় । মধ্যযুগের কোন রাজার বা কোন শাসকের প্রভাব এখানে পড়েনি । শক, হুন, মুঘোল ও ইংরেজরা অনেকেই বহু বৎসর যাবৎ শাসন করেছে । তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নৈমিষারণ্যে হিন্দুধর্মের ক্রিয়া ও জ্ঞানচর্চা স্বাভাবিকভাবে অতি প্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিক চলছে । যারা সত্যই প্রাচীন সভ্যতা দেখতে ইচ্ছুক তাঁরা এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করলেই স্পষ্ট বুঝতে ও জানতে পারবেন ।

ভৌগলিক কারণ, প্রাকৃতিক কারণ, জলবায়ু, নদনদী, কৃষি, ব্যবসা, সমাজ ও ধর্ম, প্রাচীন তথ্য ও তত্ত্বের জন্য এভূমিকে নানাবিষয়ে সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা দান করেছে । যাতায়াতের সুবিধার জন্য ট্রেন ও মোটর এবং প্রশস্ত রাস্তাঘাট প্রভৃতি বর্তমানে হয়েছে ও হচ্ছে । তবে এ অঞ্চলটি এখনও কল-কারখানা ও যন্ত্র সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র । তাই আজও এখানকার জলবায়ু অন্যান্য অঞ্চলের জলবায়ু থেকে বিশুদ্ধ ।

এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার প্রায়শঃই সহজ ও সরল । জীবন ধারণও অন্যরূপ বলা চলে । অপরদিকে অধিকাংশ ভূমিই বালিমিশ্রিত অথচ কৃষিকাজ বা এখানকার উৎপন্ন শস্যাদির স্বাভাবিক কারণ,এখানকার অধিবাসীরা খুবই পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাপরায়ণ । এখানে গোমতী নদীই প্রধান । সারা অঞ্চল ঘিরে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই এতো সজীবতা । তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে খুব বড় বড় জলাশয় ও প্রাচীন পুষ্করিনী এবং স্থানে স্থানে সুবৃহৎ জলাশয়ের অংশ এখনও দেখতে পাওয়া যায় । ৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমার সময় দু'বার দেখেছি এমনকি

ওই সকল স্থানের নাম, মানস-সরোবর, গঙ্গাসাগর, ক্ষীরসাগর প্রভৃতি আজও দেখতে পাওয়া যায় ।

এখানকার ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারনের আচার ব্যবহার খুবই নম্র ও ধর্ম-পরায়ণ । একে অন্যের প্রতি সকল অবস্থাতেই সহনশীল ও সহানুভূতিশীল । ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে যজ্ঞাদি, হোম ও সৎসঙ্গাদির প্রভাব বেশী । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তীর্থদর্শনার্থী একবার এস্থানে এলে পুনঃরায় এ ভূমির আকর্ষণে আসতে বা স্মরণ করতে বাধ্য কারণ, এটা তপোভূমি । জলবায়ু ও অন্যান্য অনুকুল অবস্থার জন্যই এখানকার কথা স্মরনীয় হয়ে থাকে ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রধানভুমিই এই নৈমিষারণ্য । বেদচর্চা এখানে হতো । ১৮টি পুরাণ, ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ এখানে লিখিত হয়েছিল মহর্ষি বাল্মীকি এখানেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন । শ্রীরামচন্দ্র নৈমিষারণ্যে এসে গোমতী নদী তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময় দেশ-দেশান্তর থেকে বহু রাজা-মহারাজা ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন । এখনও ঐ স্থানটি দশাশ্বমেধ ঘাট নামে পরিচিত ।

মহর্ষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাস । যিনি এক লক্ষ শ্লোক দ্বারা মহাভারত রচনা করেন । উহাও মহাকাব্য বলে সুপরিচিত । এরূপ কাব্যচিত, গুণমন্ডিত গ্রন্থ কোথাও নেই । তিনি এই মহাভারতেই নৈমিষারণ্যের গুণকীর্ত্তণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি । ইহাই প্রামাণিক গ্রন্থ । ব্যাসদেব এই নৈমিষারণ্যতেই চার বেদ রচনার বিভাজন করেন যা স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রুতিশাস্ত্ররূপে ছিল । তাঁর দ্বারাই ১৮টি পুরাণ, ১৮টি উপপুরাণ ও ১৮টি সহপুরাণ লিখিত হয়েছিল । ঐ স্থানটি বর্তমানে ব্যাসগদ্দী নামে সুপরিচিত ।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের কথা প্রায় সকল শিক্ষিত সমাজই জানেন । তাই অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ পাণিনির দ্বারা উপকৃত কারণ, পাণিনির ব্যাকরণ সুত্রতে বিভিন্ন দেশ, নদী ও বনের নাম লেখা আছে ।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যের ১৯সর্গতে শ্রীরামচন্দ্রের নৈমিষারণ্য আসার কথা উল্লেখ করেছেন । এটা মহাকবির কল্পনা মাত্র নয়, তাঁর জ্ঞানের

পরিচয় । দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাকবির অন্তঃলোকের বার্তা বা তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ থেকেই হয়তো উদ্ধার করেছিলেন,তাই তিনি আজও মহাকবির পরিচয়ে পরিচিত ।

৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বল্লভাচার্য্যই প্রথম ধর্মসভা ব্যাসগদ্দীতে করেন । ধর্মস্থান রক্ষার জন্য সকলকে প্রেরণা দেন । পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এস্থানে এসেছিলেন । সেজন্য এখনও গৌড়ীয়মঠ আছে । সন্ত তুলসীদাস তীর্থদর্শনের জন্য নৈমিষারণ্যতে এসে "রামচরিত মানস"-এ মনু ও শতরূপার তপস্যার কথা বর্ণনা করেছেন । অযোধ্যা থেকেই তুলসীদাস নৈমিষারণ্যতে এসেছিলেন ।

<u>গর্গমুনি</u> – গর্গসংহিতার প্রণেতা, তিনি গ্রন্থে প্রকাশ করলেন যে,মহাতপস্বী ও যোগভাস্কর শৌনিক মুনিকে দর্শন করার জন্য তিনি নৈমিষারণ্য এসেছিলেন ।

<u>সন্দীপনিমুনি</u> – শ্রীকৃষ্ণের গুরুদেব । তিনি ব্যাসদেব দ্বারা নৈমিষারণ্য গোমতীর মাহাত্ম্যের বর্ণনা শুনে নিত্যস্নানের জন্য এসেছিলেন ।

<u>পরশুরাম</u> – মাতৃবধের পর তপস্যার জন্য পরশুরাম নৈমিষারণ্যতে এসে উগ্র তপস্যায় কাটান । এখানেই পিনাকপাণি শঙ্করের বর লাভ করেন ।

<u>মহর্ষি দধীচি</u> –নৈমিষারণ্যতে অন্যান্য মুনি-ঋষিদের মত মহর্ষি দধীচির নামও উল্লেখযোগ্য । তাঁর অস্থিদ্বারা নির্মিত " বজ্র " দ্বারা বৃত্তাসুর বধ হয়েছিলেন । নৈমিষারণ্য থেকে প্রায় ৪-১/২মাইল দূরে মিশ্রিখ নামক স্থানে তাঁর আশ্রম ছিল । ওখানে দধীচিকুন্ড নামে একটি বড় পুস্করিনী বা দীঘি আছে । ৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমার পর ফাল্গুন মাসের পূর্নিমা পর্যন্ত এখানে ৫ দিন বিরাট মেলা বসে । বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীগণ ঐ ৫ দিন সৎসঙ্গাদি,কীর্ত্তন,ভজন ও ভান্ডারাদিতে মহোৎসব করে থাকেন ।

<u>কশ্যপমুনি</u> – ইনি দক্ষ প্রজাপতির মেয়ের স্বামী । পদ্মপুরাণে লেখা আছে যে তিনি একবার নৈমিষারণ্যতে এসেছিলেন । তখন মুনি-ঋষিগণ কাশ্যপমুনিকে গঙ্গা আনার জন্য প্রার্থনা জানায়, তিনি শিবকে প্রসন্ন করে গঙ্গা এনেছিলেন, সেজন্য কাশ্যপীগঙ্গা নামে আজও পরিচিত ।

<u>মার্কেণ্ডেয়মুনি</u> –বার বৎসর মন্ত্র-যজ্ঞের সময় গঙ্গা এবং সরস্বতী নদীকে এখানে এনেছিলেন সেজন্য মার্কেণ্ডেয় দ্বারা গঙ্গাবতরণ এখনও কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত ।

<u>নারদ</u> – বার-বার নৈমিষারণ্য ভূমিতে আসতেন এবং তাঁর প্রিয় ভূমি ছিল । এমনকি তাঁর বীণার তারে সর্বদাই এই তপোভূমির গুণগান শোনা যেত । পদ্মপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে নারদের আগমন খুবই স্পষ্টভাবে লেখা আছে ।

<u>ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব</u> – রঘুবংশের কুলগুরু । ইনি বিশ্বের অনেক স্থানেই বাস করে ছিলেন । শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে দিয়েই যজ্ঞ করিয়েছিলেন । দশাশ্বমেধ ঘাট এখনও দেখা যায় । আত্মতত্ত্বে শ্রীরামচন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন - এখনও সেই উপদেশ গ্রন্থাগারে পেয়ে থাকি । গ্রন্থটির নাম যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ ।

<u>ঋশ্যশৃঙ্গমুনি</u> – নৈমিষারণ্যতে তাঁর দ্বারা রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল ।

<u>লোমহর্ষণ সুত</u> –সুত শব্দের অর্থ – মহাকবি কালিদাস বলেছেন যে, 'সারথী'। মনু স্মৃতিকার মনু - ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের জাত পুত্রকে "সুত" নামে আখ্যায়িত করেছেন । ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য এবং পুরাণ কথার ক'থক ছিলেন । শৌনকাদি ৮৮ হাজার মুনি-ঋষি জ্ঞানপিপাসু থাকাতে,- লোমহর্ষণ সুত গোস্বামী তাঁর মধুরস্বরে পুরাণ কথা শুনিয়ে শান্ত রাখতেন । ইনি প্রতিভাবান ধর্মজ্ঞাতা ও ধর্ম উপদেষ্টারূপে এ অঞ্চলে পরিচিত ।

বেদব্যাসের সান্নিধ্যতা পেয়ে ধর্ম বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করায় বর্ণসংকরতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণ তাকে পুরাণ-বিশারদ হিসাবে স্বীকার করেছিলেন । বেদে অধিকার না থাকলেও বেদের ধার্মিক বিচার এবং পবিত্রতা তাঁকে মহান বানিয়ে দিয়েছিল । ব্যাসদেব তাঁর পাঁচ শিষ্যকেই বেদ ও পুরাণ বিষয়ে জ্ঞান-দান করেছিলেন । পাঁচ শিষ্যের ভিতর সুত গোস্বামী অদ্ভুত ধার্মিক ও পরিত্রাতা ছিলেন । উপরন্তু, বশিষ্ঠাদি গুরুজনের আজ্ঞা পেয়ে পুরাণের উপদেশ দান করতে থাকেন ।

লোমহর্ষন সুত মুনি-ঋষিদের দ্বারা সেবিত ও আতিথ্যের কথাও জানা যায় । পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ,শিবপুরাণাদিতে তাঁর অস্তিত্ব ও ধর্মপরায়ণতার কথা স্বীকৃত ।

<u>মহর্ষি শৌনিক</u> –নৈমিষারণ্যে তপস্বীদের ভিতর মহর্ষি শৌনিক অগ্রনী ছিলেন। পুরাণাদিতে মহর্ষি শৌনিকের দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞের উল্লেখ পাই। মহাভারতের আদিপর্বে ও ব্রহ্মপুরাণে মহর্ষি শৌনিকের বর্ণনা পেয়ে থাকি। তাঁর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে নৈমিষারণ্যের মহাযজ্ঞে লোমহর্ষন সুত এসেছিলেন। এঁরা দু'জনেই মহাভারত ও পুরাণাদির কথকতা করতেন।

মহর্ষি শৌনিক গৃহপতি এবং কুলপতি নামে এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে স্বামী নারদানন্দজী আশ্রমের পিছনে শৌনিক মহর্ষির আশ্রম ছিল বলে এখনও চিহ্নিত আছে (স্বর্ণকুটীরের নিকটেই বনের ভিতর)।

<u>স্বামী নিম্বাকাচার্য</u> –ইনি দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের বেলারী জেলাতে নিম্বপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মাতার নাম সরস্বতী, পিতার নাম জগন্নাথ ছিল। নিম্বাকের প্রকৃত নাম নিয়ামনন্দ ছিল। ভক্তমালা ২২সর্গতে পাওয়া যায়, ইনি নিমগাছে চড়ে সূর্যাস্ত দেখেতেন। তিনি বৈষ্ণব আচার্য্যরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রচার করেছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাদির ভিতর বেদান্ত,পারিজাত সৌরভ, শ্রীকৃষ্ণ স্তবরাজ, বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রদীপ গ্রন্থাদি সুপরিচিত, তিনি তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে নৈমিষারণ্য ভ্রমণে এসে আনন্দিত হয়েছিলেন।

❋ বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে সব সিদ্ধগণ নৈমিষারণ্যে ছিলেন। ❋

<u>শিবানন্দ নাগাস্বামী</u> – দিগম্বড় অবস্থায় থাকতেন। ব্যসগদ্দীর পিছনে গোমতী নদীর ধারে শ্মশানেই তাঁর বাস ছিল একটি বটগাছের তলায়। "নংগে স্বামী" বলেই পরিচিত। তিনি অধ্যাত্মিক তত্ত্ব চিন্তাতেই বেশী সময় কাটাতেন। প্রাতঃ - কালে গোমতীতে স্নান এবং সন্ধ্যায় ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরেশ্বরী ললিতামায়ের দর্শন ও উপাসনা প্রতিদিনের নিয়ম। তাছাড়া ঐ শশ্মানে বটগাছের তলায় সর্বক্ষণ কাটাতেন, তাঁর অযাচক বৃত্তি ছিল। তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন, বর্তমানে সেই স্কুলের নাম হয়েছে "বেদব্যাস সংস্কৃত পাঠশালা"। তাঁর আহারের পরিমাণ ছিল খুবই কম। বর্ষাকালেও ঐ বটগাছের তলাতেই থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণ বলেন যে, বর্ষাকালে বটতলাতে একটি গন্ডিরেখা টেনে দিতেন, কোন প্রকারেই বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে পারতো না। বৈষ্ণব হয়েও মা ললিতা-র বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নাগাস্বামীর বহু যৌগিক সিদ্ধি ছিল, তাছড়াও তাঁকে তপস্বী বিভূতিশীল মহাপুরুষ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

<u>উড়িয়াবাবা</u> -- ১৯৭৪ সালে আমি যখন নৈমিষারণ্য তপোভূমিতে প্রথম যাই তখন উড়িয়াবাবার আশ্রমেই প্রথম উঠি । বর্তমানে নৈমিষারণ্যতে সুপরিচিত " টাটিয়া বাবা " একসাথেই এ আশ্রমে ছিলাম । "টাটিয়া বাবা" এখন অন্যত্র আশ্রম করেছেন । " টাটিয়া " অর্থে, চটের পোষাক শুধু ব্যবহার করেন । উড়িয়া বাবা খুবই শান্ত প্রকৃতির সন্ন্যাসী ও প্রেমী এবং এটা তাঁর ব্যবহার ও কথা বার্তাতেই সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে । টাকা পয়সার প্রতি কোন লোভ বা মোহ ছিল না । উপরন্তু, অতিথি সেবাপরায়ণ ছিলেন । ৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমা তিনি পাল্কীতে করতেন । এই আশ্রমের দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলও আছে । কয়েকটি সমাধি বেদী রয়েছে, কোন মন্দির নেই । এই আশ্রমটি মা ললিতা মন্দিরের পিছন দিকে খুব পরিচিত আশ্রম,উঁচু স্থানে অবস্থিত ।

<u>বাল্মিকী রামায়ণ ও নৈমিষারণ্য।</u>

মহাকাব্য রামায়ণের প্রণেতা মহর্ষি বাল্মিকী তাঁর কাব্যতে নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,কাজেই মহর্ষির দ্বারা এই স্থানটী সুপরিচিত ছিল । এমনকি, রামায়ণের পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের নৈমিষ অতীব প্রিয় ছিল । সেজন্য পবিত্র গোমতীর তীরে এক মহান যজ্ঞ করার সংকল্প করেছিলেন । এই যজ্ঞতে বহু ধর্মবেত্তা, যাজ্ঞিক ঋত্বিকগণ উপস্থিতও ছিলেন । শ্রীরামচন্দ্র এটা জানতেন যে, এই পবিত্র ভূমিতে যজ্ঞ করতে পারলে অনেক সুফলই পাওয়া যাবে । রাময়ণের উত্তরকান্ডতে মহর্ষি বাল্মিকী লিখেছিলেন যে -- লোকরঞ্জন ভবভয় ভঞ্জন শ্রীরাম সদলবলে নৈমিষারণ্যেতে পৌছান । তারপর ওখানে একটি সুমনোহর যজ্ঞবেদী তৈরী করান যা দেখে শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন । এই যজ্ঞটির নাম ছিল -'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। তিনি উপস্থিত থাকাতে বহু দূর-দূরান্ত থেকে দেশের রাজা সকল ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন । ঐ স্থানটী নৈমিষারণ্যতে এখনও বিদ্যমান 'দশাশ্বমেধঘাট'— শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের সাক্ষী বহন করছে । মহর্ষির এই উপযুক্ত প্রসঙ্গেতে - নৈমিষারণ্যের প্রাচীনতা এবং পবিত্রতার প্রমাণ আজও পাওয়া যায় যে, নৈমিষারণ্য ত্রেতাযুগকালীন ঐসময়ে কিরূপ অধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন ছিল ।

নৈমিষারণ্যের প্রাচীন তপোভূমি দেবদেবেশ্র, এখানে ১টি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ, গোমতীর ধারে। পৃষ্ঠা ১৬
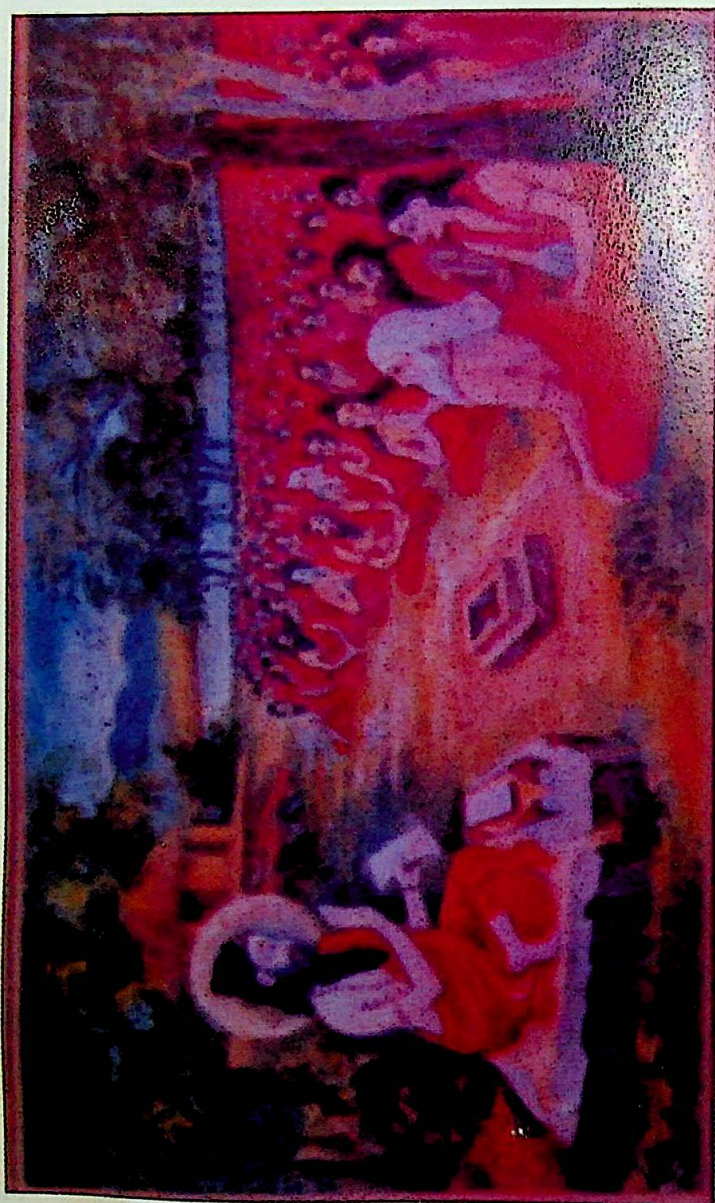
সূতদ্দীতে —সূতগোস্বামীর দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে রত, মুনিঋষিগণ। পৃষ্ঠা ২১

নৈমিষরণ্যে-শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমাতার পুরাণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত— আদিনারায়ণ বা পুরাণপুরুষ মূর্ত্তি।

পৃষ্ঠা ২৩

শ্রীশ্রীমাতারআনন্দময়ীর আশ্রমের পুরাণ মন্দির। পৃষ্ঠা ২৪

ব্যাসগদ্দী নূতন সংস্কার   পৃষ্ঠা ২৭
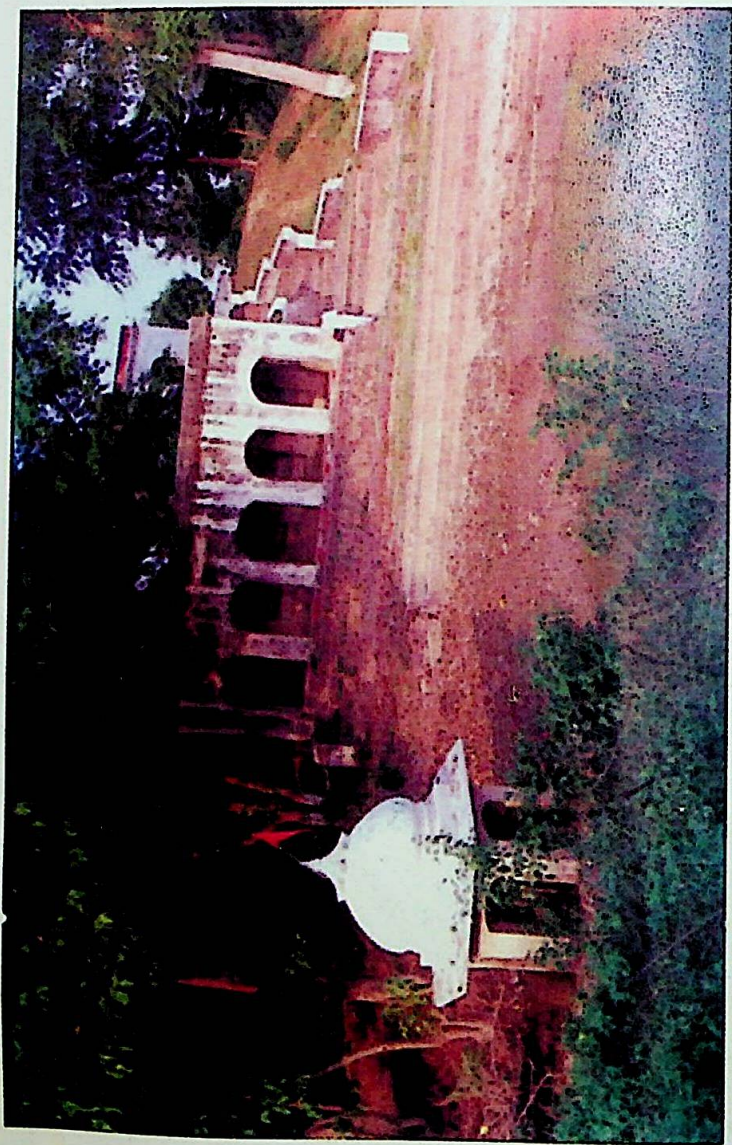
দশাশ্বমেধ ঘাট—শ্রীরামচন্দ এখানে যজ্ঞ করেছিলেন এবং মহামুনি বাল্মীকি লব ও কুশের দ্বারা রামায়ণপাঠ করিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। পৃষ্ঠা ২৭
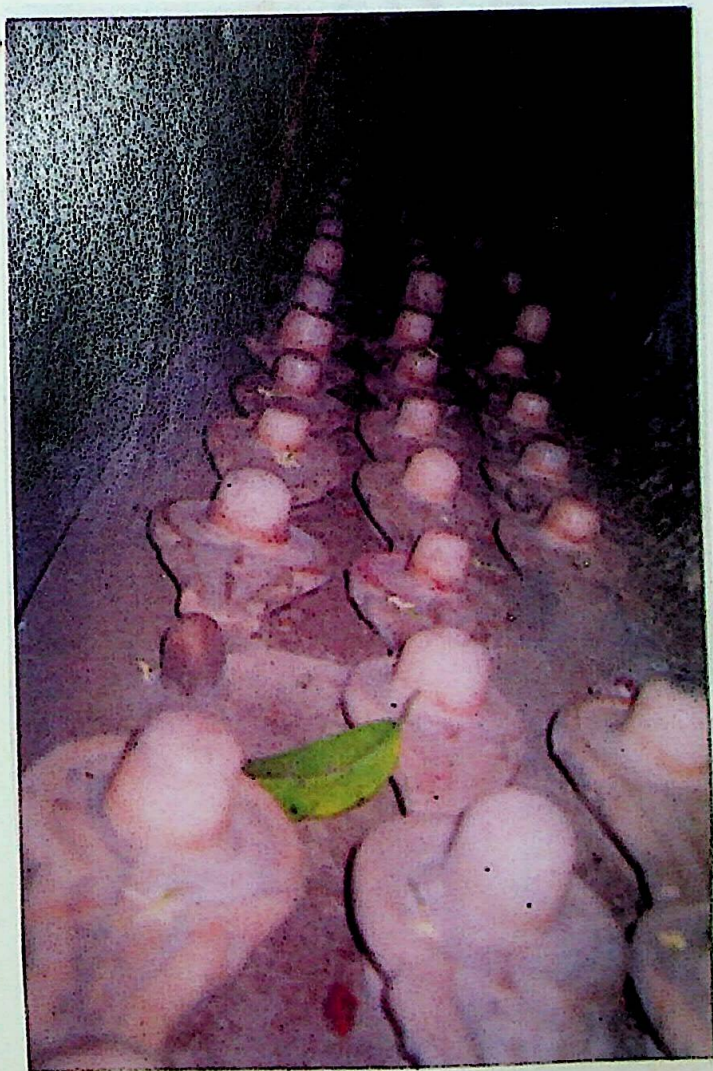
নৈমিষারণ্যের স্বামী নারদানন্দ আশ্রমেতে ১০০৮ টি শিব লিঙ্গ। · পৃষ্ঠা ২৮
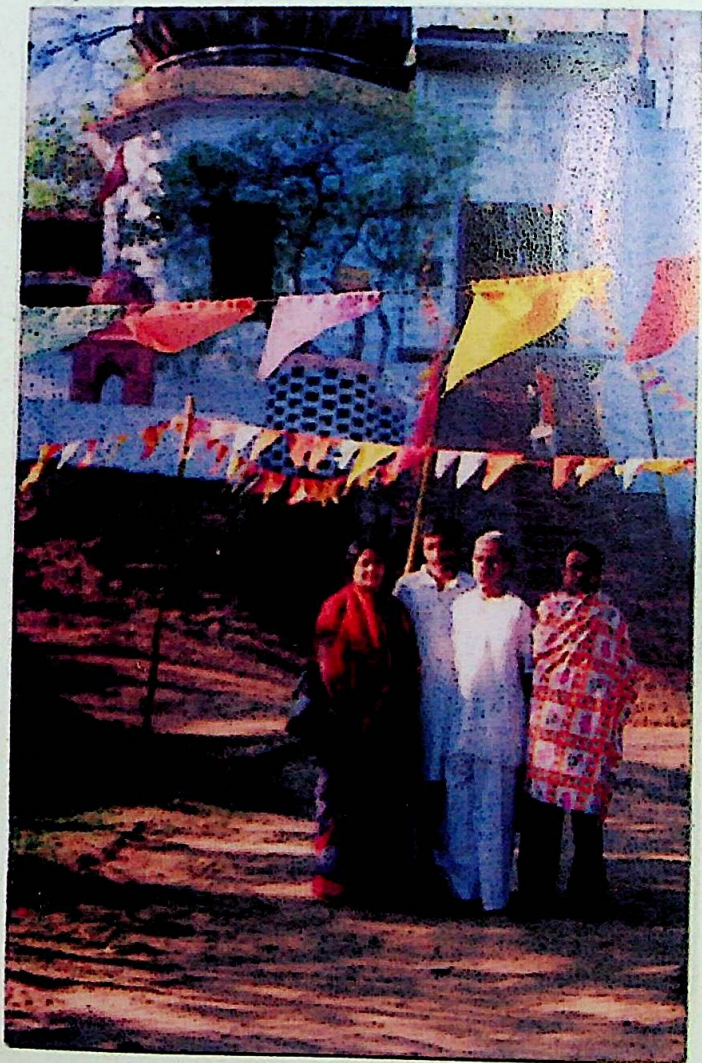
সূত গোস্বামীর গৃহ—ব্যাস শিষ্য সূত গোস্বামী এখানেই নৈমিষারণ্যের সমস্ত মুণিঋষিগণকে মহাপুরাণ সমূহ পাঠ করে শোনাতেন। পৃষ্ঠা ২৯
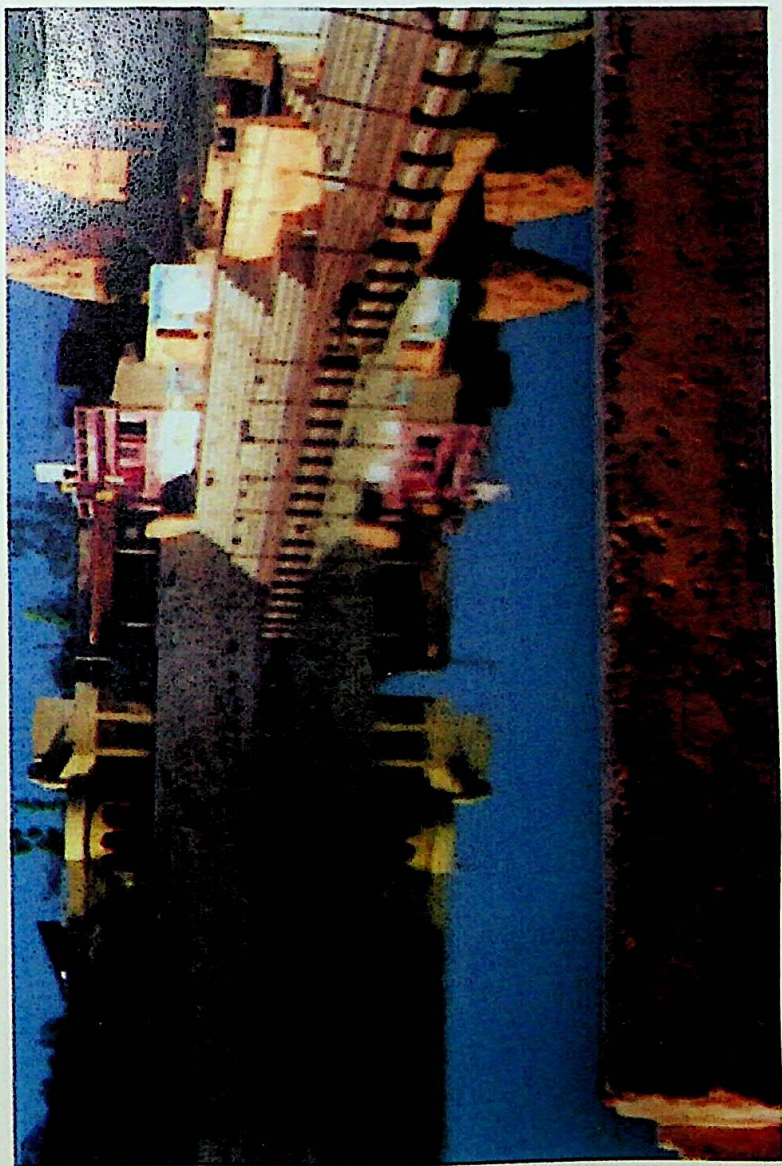
মিশ্রিয়তীর্থতে— দধিচীমুণির কুণ্ড।   পৃষ্ঠা ৩৮

মহর্ষি দধীচিমুনির অস্থি দান ক্ষেত্র   পৃষ্ঠা ৩৮

ব্যাসগদ্দী এখানেই ব্যাসদেব, বেদের বিভাজন, ৫৪টি পুরাণ লিখেছিলেন। বামদিকে রাজা মনু ও রাণী সতরূপার তপস্যাস্থল। পৃষ্ঠা ৪৪
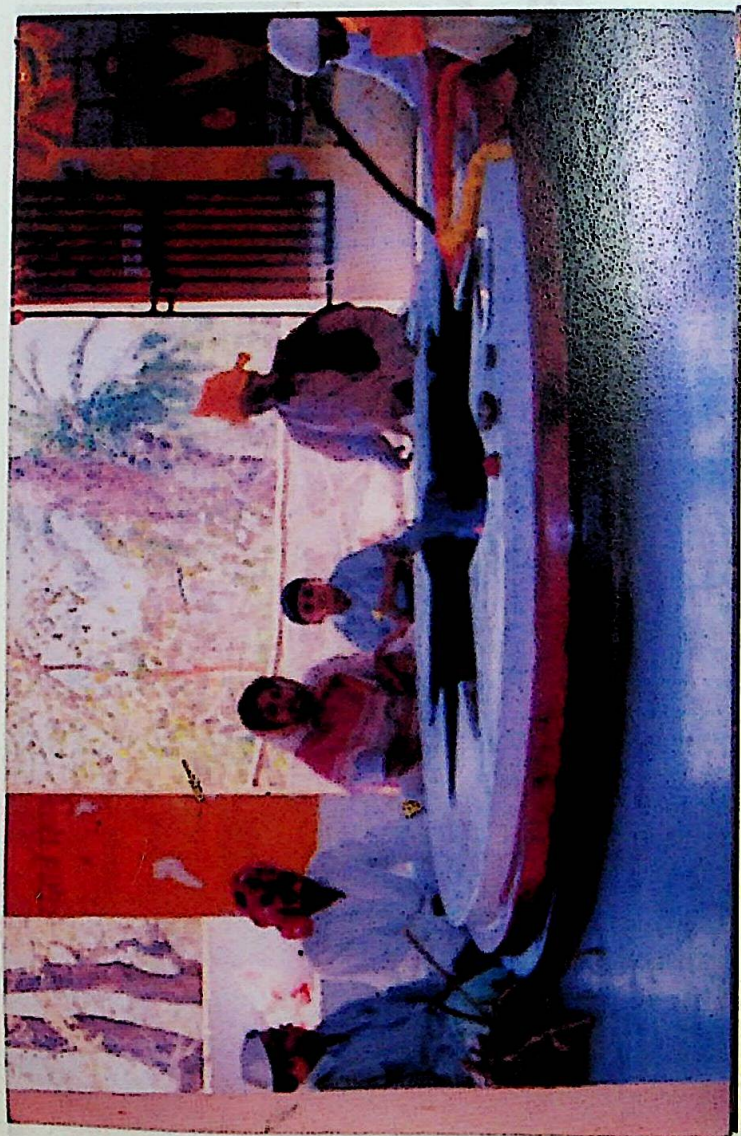
নৈমিষারণ্যে তপোভূমিতে ব্যাস গদীতে যজ্ঞাবস্থায় যজ্ঞের
ঋত্বিক শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্যরা ২০০৬ সন। পৃষ্ঠা ৪৪
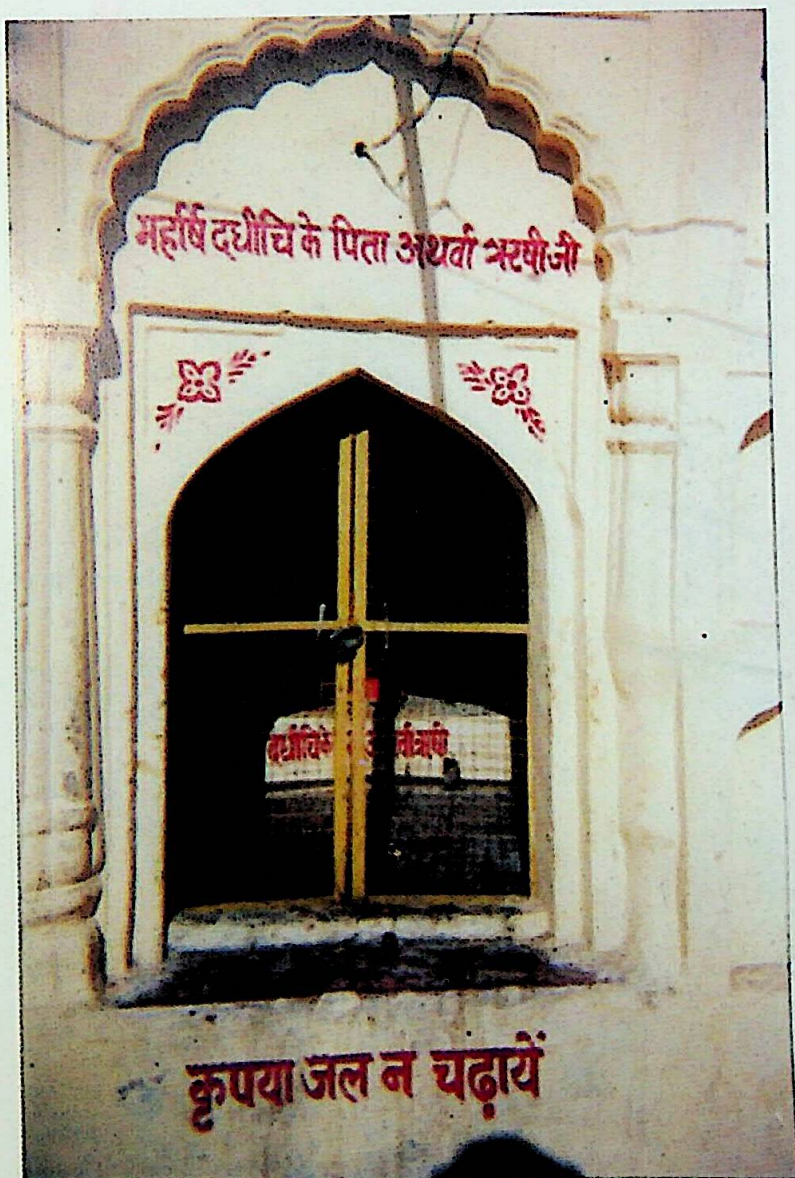
মহামুণি দধীচির পিতার সমাধিস্থল। পৃষ্ঠা ৪৮

স্বামী নারদানন্দ আশ্রমে, স্বর্ণকুটীরে— শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য-এর সাধনরতের পরাবস্থা। পৃষ্ঠা ৬৮
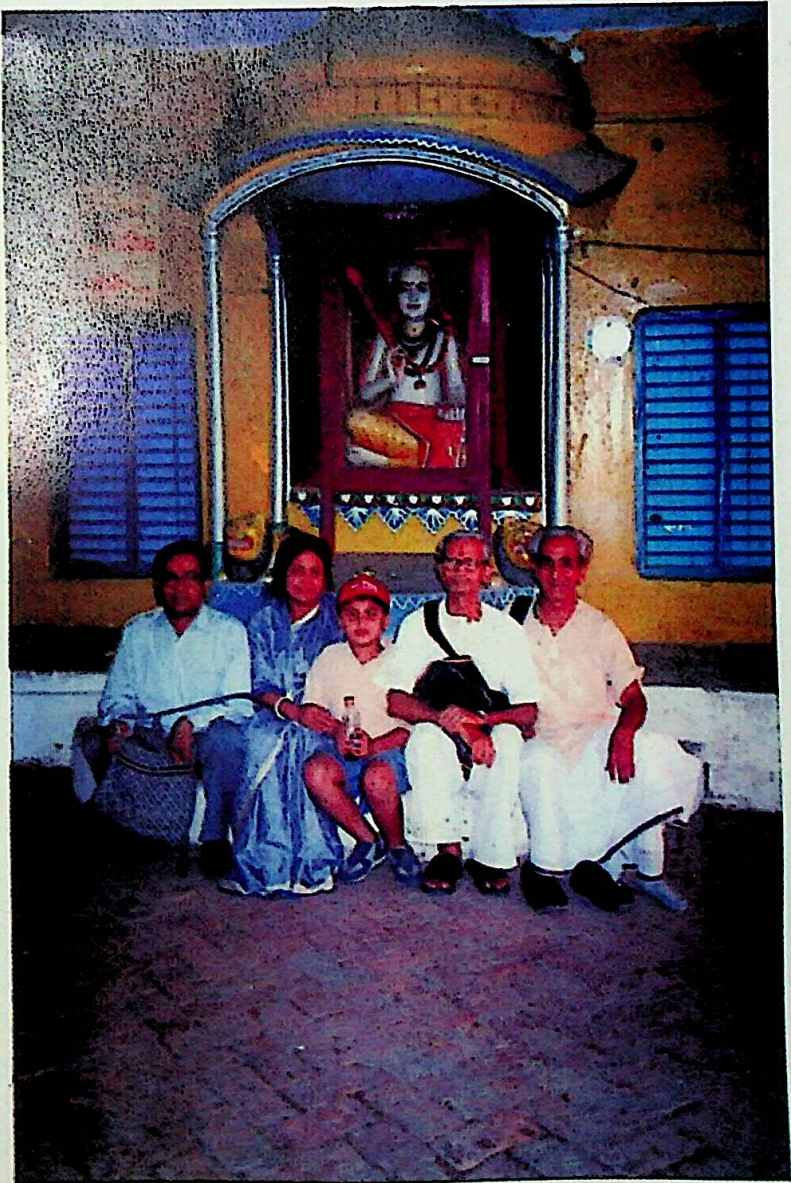
স্বামী নারদানন্দ আশ্রমে, স্বর্ণকুঠীরের নীচে আদি শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি। পৃষ্ঠা ৬৯
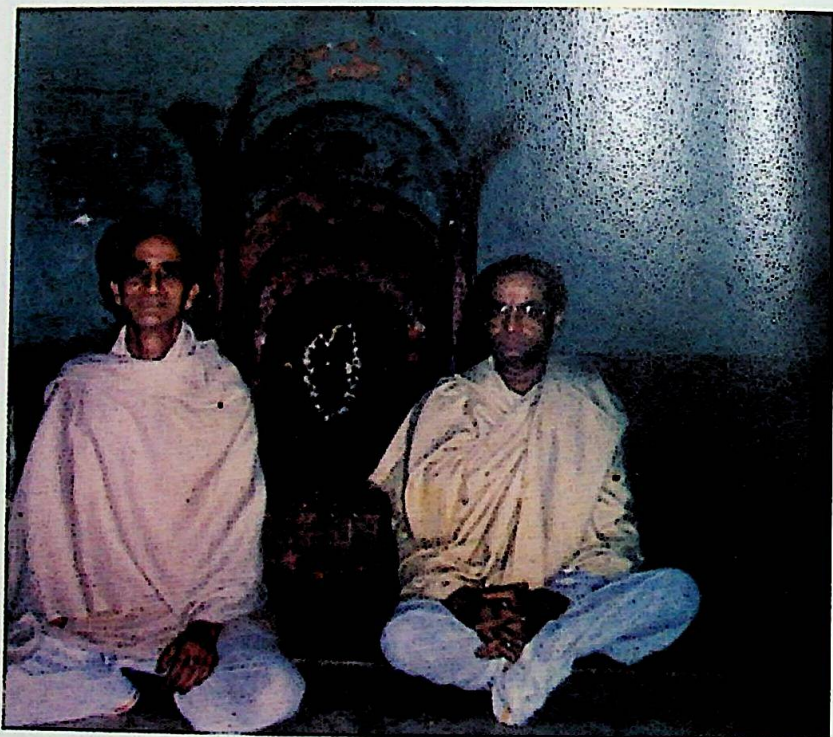
ললিতাদেবী বা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরে ডানদিক হতে—ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য আচার্য্য নির্মল পাণিগ্রাহী ও চণ্ডী ভট্টাচার্য্য (লেখক)

৯ মহাভারত ও নৈমিষারণ্য। ৎ

মহর্ষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস,যিনি এক লাখ শ্লোকেতে 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন । আজ পর্য্যন্ত এতো বৃহৎ এবং কাব্যোচিত গুণে পরিপূর্ণ কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি । মহাভারতে বেদব্যাস নৈমিষারণ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনুপম এবং এই পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্য, মুণি-ঋষি ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিত । এমনকি,প্রজাপতি ব্রহ্মা যেখানে দেবতাগণের সাথেই বাস করতেন । একমাস যদি এখানে থেকে এই তীর্থের সেবা করা যায় তবে, সেই তপস্বী - রাজসূয় যজ্ঞের মত ফললাভ করবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় । যত তীর্থ এই ধরা-ধামে আছে তার সবই এই নৈমিষারণ্যেতে আছে ।

বেদব্যাস এই নৈমিষারণ্যেতে চার বেদের বিভাজন এবং অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন । গোমতীর তীরে বর্তমান ব্যাসগদ্দী -- ব্যাসের কৃতিত্ব এবং তপোভূমির পরিচয় ।

৯ মহাভারতের কাম্বন এবং নৈমিষারণ্য। ৎ

মহাভারতের বনপর্বতে কাম্বতীর্থের উল্লেখ আছে । এই কাম্বময় হয় না । বন-পর্বের অনেক স্থানেতে কাম্যবন,সরস্বতী নদীর কিনারে বালুকাময় স্থানে অবস্থিত যেখানে অনেক আশ্রম,রমনীয় জলাশয় এবং হ্রদ প্রভৃতি আছে । ওখানে বড় বড় হাতীর উল্লেখ ছিল,যাঁরা ঐ বনেতে বাস করতো (বর্তমানে নেই) । ভারতের আটটি বনে হাতী বাস করার উল্লেখ পাওয়া যায় । মহাভারতে লাল হাতীর কথাও বর্ণিত হয়েছে,তাছাড়া কমলা বর্ণের ঐরাবত হাতীর কথাও উল্লেখ আছে । এজাতীয় হাতী বিশেষভাবে প্রাচ্যবন, হিমালয়, প্রয়াগ এবং গঙ্গানদীর তীরে মহাবনে ছিল । এই বন সরস্বতী এবং বালুকাময় স্থান হ'তে আলাদা । কাম্যক বনের হাতী-গুলিকে চেনা সম্ভব হয়নি । কাম্যকবন ছোটনাগপুর হ'তে পারে না কারণ, নাগপুর যে গোমতীনদীর তীরে ছিল, তা ডঃ অবস্তীর পুস্তকে প্রমাণ পাওয়া যায় । ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার পথে 'নগবাও' নামে যে স্থানটি পড়ে সেখানে প্রাচীন রাজাদের রাজধানী ছিল । জানা যায় যে, গোমতী নদীর তীরে কাম্যবন নামে যে বনের উল্লেখ পাওয়া যায় - সেটি মহাভারতের কাম্যবন এবং মহাভারতের কাম্যবনই নৈমিষের-ই কাম্যবন ।

পুরাণ এবং নৈমিষারণ্য এই দুইটীর ভিতর সম্বন্ধ ওতোপ্রোত ভাবে আছে। পুরাণের মাহাত্ম্য নৈমিষ থেকেই পুরাণের মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণ গ্রন্থের চর্চ্চার সাথে সাথে নৈমিষারন্যের নাম স্বাভাবিকভাবে উদিত,তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। কারণস্বরূপ, বলা যায় যে -- এই নৈমিষেতে কোন সময় ৮৮ হাজার মুনি-ঋষিগণ যজ্ঞ ও জ্ঞান চর্চ্চার জন্য একত্রিত হয়ে বাস করতেন। তাদের মধ্যে শৌনিক ঋষির নামই উল্লেখযোগ্য। ব্যাস শিষ্য সুত গোস্বামী এখানেই সমস্ত মুনি-ঋষিদের শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন।

সুত গোস্বামীকে সকল মুনি-ঋষিগণই খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি সুত গোস্বামীকে ভগবানের অবতার বলেও অনেক মুনি-ঋষিগনণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। শৌকনাদি ঋষিগণ শাস্ত্র ও পুরাণাদির বিশেষজ্ঞ ভেবে সুত গোস্বামীকে ঐ সকল শাস্ত্রাদি শোনানোর জন্য নিবেদন করেছিলেন, এই অরণ্যেতে ঋষি-গণকে পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র নিয়মিত শুনিয়ে ছিলেন। এর বর্ননা পুরাণাদিতে অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ আছে।

সত্যনারায়ণ ব্রতকথাতে যেমন জনসাধারণ শান্তি পায় ও পবিত্র ভাবনার উৎস তেমনি এই নৈমিষ ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থান হিসেবে নিজের মহত্ব ও নিজের ধারণ-পালনও রক্ষা করে চলছে। নানাদেশে হতে রাজারা এক্ষেত্রে এসে প্রকৃত শান্তি ও জ্ঞান চর্চ্চায় সাফল্য লাভ করেছেন।

পাণিনি এবং নৈমিষারণ্য।

প্রসিদ্ধ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা পাণিনিকে কে না জানেন। যিনি সূত্রতে ব্যাকরণের নিয়মে-তে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পানিনির বিষয় ব্যাকরন। কবি বা লেখক নিজের দেশ-কাল এবং সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এর কারণ এই যে,অষ্টধ্যায়ী সূত্রতে যত্র-তত্র বিভিন্ন দেশের নাম,বনের নাম এবং নদীর নাম পাওয়া যায়। অষ্টধ্যায়ীর এক স্থানে ছয়টি বনের নাম লেখা আছে –

১) পুরগাবনা,২) মিশ্রিকাবন,৩) শারিকাবন,৪) কোটরাবন, ৫) সিগ্রিকাবন, ৬) অগ্রেবন। "মিশ্রিকাবন - নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রের অর্ন্তগত যা মিশ্রিত নামে বিখ্যাত আছে।

ৠ কালিদাস এবং নৈমিষারণ্য । ৩ৠ

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের ১৭সর্গতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নৈমিষ আগমনের উল্লেখ আছে । ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পৌঢ় অবস্থাতে নিজের পুত্রদের রাজ্যভার দিয়ে, স্বয়ং নৈমিষারণ্যতে চলে যান । এমনকি কথিত আছে যে, ৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমার পথে হত্যাহরণ নামক স্থানে তপস্যা করেন । এ প্রকার বর্ননা কবির কল্পনা প্রসূত শুধুমাত্র নয়, এটা কবির মহাদৃষ্টি ও কবি কবিপ্রজ্ঞার পরিচায়ক । মহাকবি কালিদাসের সময়েও(B.C 2/3) নৈমিষারণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যপূর্ন ছিল ।

ৠ ইতিহাসকার ডালমী এবং নৈমিষারণ্য। ৩ৠ

বিদেশী পর্য্যটক ও ইতিহাসকারদের কাছে ভারতবর্ষ বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর । পৃথিবীতে যখন তেমন সাহিত্য, জ্ঞানচর্চ্চা, জ্যোতিষ, সামাজিক, প্রভৃতির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেনি, তখন বিদেশী পর্য্যটক ও ইতিহাসকারের ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতি, শিল্প প্রভৃতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান, পরবর্তী-কালে তাঁরা তাঁদের পুস্তকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন ।

বিদেশী পর্য্যটকদের ভিতর - ফাহিয়াং, হিউয়েঙসান, মেগাস্থিনিস্ ,ডালমী, ইবন্‌বতুতা ইত্যাদি ভারত ভ্রমণের নিমিত্তে এসেছিলেন । ঐ সকল পর্য্যটকগণ তৎকালীন ভারতবর্ষের স্থিতি যেরূপ দেখেছিলেন সেরূপই উল্লেখ করেছিলেন তাদের পুস্তকে । তাদের এই তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত লেখা থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার অনেক সুবিধা হচ্ছে ।

ডালমী তাঁর নিজের গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন যে, এই ভারতের জনপদে বহুজাতি,অনেক গ্রাম, বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতি রয়েছে এবং এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । এই স্থানটাই নমিষার অর্থাৎ নৈমিষারণ্য বলে, ডঃ অবস্থী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকার উল্লেখ করেছেন ।

৶ উত্তর -মধ্য ও নৈমিষারণ্য। ৵

উত্তর ও মধ্যকালেতে নৈমিষ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল । কিন্তু বিদেশী আক্রমনে এখানকার ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মর্য্যদা কিছুটা ক্ষুন্ন যে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । হিন্দুদের জবরদস্তি বা জোর করে মুসলমান বানাচ্ছিল । হিন্দু তীর্থস্থানগুলি ধ্বংস করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি । এমনকি তরবারির আঘাতে প্রতিমা ও মুর্তিগুলিতে আঘাত চিহ্ন আজও দেখা যায় । শুদ্ধাদ্বৈত -সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য সর্বপ্রথম ব্যাসগদ্দীর সংস্কার-সাধন করেন । সন্ত তুলসীদাস তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে নৈমিষারণ্য এসেছিলেন, তিনি রামচরিতমানস-এ প্রাচীন মনু ও শতরূপার তপস্যার কথা বর্ণনা করেছেন । নৈমিষারণ্য দর্শনের ফলস্বরূপ তুলসীদাস রামচরিত মানস-এতে মনু ও শতরূপার তপস্যার বর্ণনা করে লিখেছিলেন যে,

" তীরথবর নৈমিষ বিখ্যাতা । অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা ।
পহুচে জাই ধেনুমহ তীরা । হরষি নহানে নির্মল নীরা " ।

এই বর্ণনা তুলসীদাসের নৈমিষের প্রতি অনুরাগ এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের পরিচায়ক ।

৶ প্রাচীন এবং বর্তমান নৈমিষারণ্যের তাদাত্ম্য। ৵

কোন দেশ অথবা স্থানের প্রামাণিকতা জানার জন্য, সেদেশের ভৌগলিকতা ও পরিস্থিতি সমূহের পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন বা অনিবার্য্য হয় ।

সময় পরিবর্তনশীল । সময়ের পরিবর্তনের সাথে,ভৌগলিক পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে । যা হাজার বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিল তা, এখনও ঐ ভাবেই বিদ্যমান থাকবে তার আবশ্যিকতা নাও থাকতে পারে । কোনো দেশ বা স্থানের প্রামাণিকতা পাওয়ার জন্য –

১। লেখা বা সাহিত্য, ২।পুরাতত্ত্ব , ৩। জনশ্রুতি আবশ্যক হয় ।

১। গ্রন্থ ও সাহিত্য —সমস্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক গ্রন্থ, কোন্ সময়ে লেখা হয়েছিল, কোন পরিস্থিতিতে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল। বিদ্বান ব্যক্তি ও মহাজন দ্বারা লিখিত নৈমিষারণ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক নৈমিষারণ্য গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত, জনগণের পূজিত - তপোভূমি।

২। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ লেখা হয়েছিল, নৈমিষারণ্যের গোমতী নদীর তটে তাহা নিশ্চিত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এই নৈমিষারণ্যতেই সুসম্পন্ন করেছিলেন মহাভারতের বন পর্বতে নৈমিষারণ্য গোমতী নদীর পুণ্যতটে অবস্থিত বলে লেখা আছে।

"ততো দেবর্ষি সহিতা সরিতা গোমীমনু।
দশাশ্বমেধনা জহু জাহ্নরর্থা স নির্গলান।।"

দেবর্ষিগণের পূজিত ভূমি সুন্দর গোমতীতটে, পুণ্যতীর্থ এবং দেবতাগণের যজ্ঞ-ভূমি ছিল। পান্ডবগণ অজ্ঞাত বাসের সময় নৈমিষারণ্য এসেছিলেন ও তীর্থ অভিষেক, গোদান -ধনাদি দান করেছিলেন।

নৈমিষারণ্য তপোভূমি।

মহাভারতের বনপর্বতে স্পষ্টরূপে উদাহরণ পাওয়া যায় যে, — ধৌমমুনি সর্বপ্রথম পান্ডবগণকে পূর্বভারতের বিষয় জ্ঞান করার সময় বলেছিলেন, গোমতী তীরে এই তপোভূমি নৈমিষারণ্য অতি প্রাচীন কাল হতেই বিভিন্ন রাজন্যবর্গদের দ্বারা সেবিত, যজ্ঞভূমিরূপেও এ-স্থানটি দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয় ভূমি এবং এই পুণ্যতীর্থতে সমস্ত দেবতাগণ মানব সমাজের কল্যাণ বিধানের জন্য সর্বদাই আসতেন ও বাস করতেন। (মহাভারতের বনপর্ব ৯৫/১)

মহাভারতের শান্তিপর্বের একস্থানে বর্নিত আছে গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যতেই "ধর্ম চক্র" প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। ঐ স্থানটি-ই বর্তমানে চক্রতীর্থরূপে পরিচিত।

" যত্র পূর্বাভিস্বর্গেণ ধর্ম চক্র প্রবর্ত্তিতম্।
নৈমিষে গোমতী তীরে তত্র নাগাদ্যয় পুরম্।।"

নৈমিষারণ্য যে গোমতীর তীরে অবস্থিত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই শ্লোকের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি । এটাই উপযুক্ত প্রমাণরূপে ব্যক্ত হয়েছে ।

১) আনন্দ রামায়ণেতে ভগবান শ্রীরামের তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গের বর্ননা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, শ্রীরাম নৈমিষারণ্য এসেছিলেন,এবং গোমতীতে স্নান করে, সুত গোস্বামীর দর্শন প্রাপ্ত হন । এমনকি তারপর শৌনিকাদি ঋষিগণের পূজা করেন ।

২) পদ্মপুরাণে উত্তরখন্ডতে লিখিত আছে যে, রাজা মনু এই নৈমিষারণ্য তপোভূমিতে পুত্র প্রাপ্তির জন্য ১ হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন । রাজা মনু ও রানী শতরূপার তপস্যার ক্ষেত্র এখনও ব্যাসগদ্দীর পাশে প্রমাণস্বরূপ চিহ্নিত আছে ।

৩) বামন পুরাণেতে – চিত্রাঙ্গদা এবং সুরথের যে আখ্যান আছে, তাতে নৈমিযারণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় ।

৪) পদ্মপুরাণে ১ম খন্ডতে গোমতীর বর্ননা লেখা আছে । তাতে যজ্ঞ-বারাহ দেবদেবেশ্বর, চক্রতীর্থাদির উল্লেখ পাওয়া যায় । বর্তমানেও নৈমিষারণ্য-তে ঐসব স্থান চাক্ষুস দেখা যায় ।

৫) পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তার সমস্তই নৈমিষারণ্যতে আছে ।

৬) শক্তিপীঠরূপে লিঙ্গধারনী নামক ললিতা শক্তিপীঠ বিদ্যমান ।

৭) ৮৮ হাজার মুনি-ঋষিগণ মিলিত হয়ে এই নৈমিষ বনে যজ্ঞ করেছেন ।

৮) নৈমিষারণ্যের মধ্যে ৬ কি.মি টোডরমলের জন্মস্থান লহরপুর এখনও দেখা যায় ।

৯) প্রসিদ্ধ বিদ্বান **V.E.Mani** নিজের লিখিত গ্রন্থ **"Puranic Encyclopedia"** -এতে নৈমিষারণ্য,সীতাপুর জেলাতে অবস্থিত লিখেছেন । **Namisha is very famous in the Purans. It is considered to be record place. Neimsar is the modern name for the place and it is in the Sitapur zilla of North India**

১০) শিব পুরাণেতে কোটি রুদ্রসংহিতাতে উত্তর দিকে শিব লিঙ্গের বর্ননা করার সময় - গোকর্ণ, মিশ্রিত, নৈমিষ এবং হত্যাহরণ স্থানের শিব-লিঙ্গকে বিশেষ মর্য্যদা দিয়েছে ।

১১)পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নৈমিষারণ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি অতি প্রাচীন বলে স্বীকৃত হয়েছে,এর ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি প্রাচীনত্বের সাক্ষী বহন করছে । তপস্যা, জপ, ধ্যানের উপযুক্ত স্থান বলে স্বীকৃত হয়েছে ।

১২)মহারানী অহল্যাবাঈ(মধ্যপ্রদেশ) চক্রতীর্থের জীর্ণ অবস্থা থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন । ওখানে ধর্মশালা নির্মান করিয়েছিলেন । যার শিলালিপি আজও দেখা যায় ।

১৩)জনশ্রুতি আছে যে রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য চক্রতীর্থের পারে এক গনেশ মন্দির স্থাপনা করেন, যেখান থেকে নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার শুরু হয় । এর প্রাচীনত্ব মনে হয় না । সম্ভবতঃ এটি পরবর্ত্তীতে পুনরুদ্ধার হয়েছে । নারদ-পুরাণ, শিবমহাপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, বায়ুপুরাণ এবং সহ-পুরাণগুলি,ভগবান ব্যাসদেবের নির্দ্দেশে তাঁর শিষ্য দ্বারা (বৈশাম্পায়ণ সমস্ত পৈলী এবং জৈমিনি) লিখিত হয়েছিল । সেই থেকে শ্রী শ্রী মাতা আনন্দময়ীর আশ্রমটীর নামাকরণ হয়েছে পুরাণ মন্দির । অনেক পুরাণ এই মন্দিরে সংরক্ষিত আছে ।

ভারতবর্ষে পুণ্য অরণ্যাদির কথা বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা থাকলেও,সমস্ত গ্রন্থতেই নৈমিষারণ্যের পুণ্য অরণ্যাদি বিশেষ স্থান পেয়েছে ।

১। দেবীপুরাণেতে - ৭টি অরণ্য পুণ্যদায়ক বলে উল্লেখ আছে ।

২। শিব রত্নাকর গ্রন্থে - ৮টি অরণ্য পুণ্যদায়ক বলে উল্লেখ আছে ।

৶ তীর্থের মাহাত্ম্য। ৫

তীর্থ শব্দটি " তৃ " ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ - পার হওয়া (সাতার দিয়ে পার হওয়া) । তীর্থ মানুষের নানা প্রকার পাপ তাপ থেকে মুক্ত করে,ভবসাগর হতে মুক্ত করে দেয় অর্থাৎ মানুষ ক সংসার সাগর পার করে দেয় । পবিত্র স্থানই হচ্ছে তীর্থ ।

তীর্থের সাথে শুধু পবিত্র স্থানই নয়, এবং পবিত্র নদীর দ্বারা পরিবৃত সম্বন্ধই নয়, তীর্থ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় । তীর্থের সীমা অসীম, সঙ্কুচিত নয় । সত্যই - তীর্থ, ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহই তীর্থ । সমস্ত প্রাণীগণের দয়া ও সরলতা তীর্থ হতেই প্রকট হয়, দান ও তৃপ্তি তীর্থতেই পাওয়া যায় । ব্রহ্মচর্য্য পালনের উৎকৃষ্ট স্থান, জ্ঞানই তীর্থ, ধৈর্য্যই তীর্থ । মনের বিশুদ্ধতা হলে তাহাই তীর্থেরতীর্থ মহাতীর্থ । উপাচার সর্বস্ব পূজার চেয়ে মনের বিশুদ্ধতা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ, সেজন্যই বলা হয় — দেহ-মন-প্রাণের বিশুদ্ধতা রক্ষাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । মনের কলুষতাই পাপের মূল কারণ এমনকি, - দুঃখ ও ব্যাথার একমাত্র উৎস স্থল ।তাই মনের নির্মলতা ঈশ্বর প্রাপ্তির সহজ সাধন উপায় । তীর্থ মনকে সরল এবং নিমর্ল করে । খন্ড থেকে অখন্ডতে পৌছিয়ে দেয় ।

তীর্থের ঐতিহ্য তুচ্ছ নয়, প্রমাণস্বরূপ বলা যায় —ঋক্‌বেদের দশম মন্ডলেতে তীর্থ শব্দের প্রয়োগ মাহাত্ম্য আছে । তৈত্তিবীয় ও মৈত্রায়নী সংহিতাতেও তীর্থের সার্থকতার উল্লেখ আছে এবং শৌনকীয় সংহিতাতেও দেখা যায় । .তীর্থের মর্য্যদা অতি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখিত হওয়ায় তীর্থের মাহাত্ম্য ও ঐতিহ্য চিরস্বীকৃত । সনাতন ধর্মেতে তীর্থ পরিক্রমা ও তীর্থতে পুনঃশ্চারণ ও নাম-জপাদির ফল বহুলাংশে অধিক পাওয়া যায় । উপনিষাদিতে তীর্থের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে । বোধায়ন, স্রোত সূত্রতে তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় । তীর্থে বহুজনকে বাড়ী ঘর বানিয়ে আজীবন বাস করতে দেখা যায় তাঁদের তীর্থবাসী বলে । ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ও তীর্থের মর্য্যদা ছিল ।

ৼ৩ তীর্থের প্রকার ভেদ । ৩ৎ

ব্রহ্মপুরাণে তীর্থগুলির প্রকারভেদ বর্নিত হয়েছে । যথা –

১) দেবতীর্থ, ২) আসুরতীর্থ, ৩) আর্য্যতীর্থ, ৪) মানুষতীর্থ ।

ক) মানুষতীর্থ থেকে আর্য্যতীর্থ শ্রেষ্ঠ ।

খ) আর্য্যতীর্থ হতে আসুরতীর্থ উৎকৃষ্ঠ ।

গ) দেবতীর্থ সবতীর্থ থেকে মহান বলা হয়েছে ।

যে তীর্থ ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি দেবতীর্থ নামে উল্লিখিত । অসুরগণের দ্বারা যে তীর্থগুলি স্থাপিত হয়েছে,তা আসুরীতীর্থ নামে জানা যায় । দেবস্থানেতে যে তীর্থগুলি দেবতা এবং ঋষিদের তপস্যার দ্বারা স্থাপিত হয়েছে তাকে আর্যতীর্থ বলা হয় । যে সকল তীর্থ মানুষের দ্বারা তৈরী সেগুলি নিজেদের যশ,প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য, অভীষ্ট পুরণের জন্য এবং লোক-কল্যাণের জন্য স্থাপিত হয়েছে, সেগুলিকে মানুষতীর্থ বলে । যে সকল নদী বিন্ধ্যপর্বত এবং হিমালয় পর্বত হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, তা অত্যন্ত পুণ্যদায়ক ও দেবতীর্থ নামে অভিহিত । সেই প্রকার - কোলাসুর, বৃত্রাসুর, ত্রিপুরাসুর, অন্ধক প্রভৃতির দ্বারা স্থাপিত তীর্থ পুষ্করতীর্থ নামে পরিচিত হয়েছে । প্রভাস, ভার্গব, অগস্ত্য নর-নারায়ণ,বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম কশ্যপ এবং মনু প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা সেবিত, সেইসব তীর্থগুলি আর্য্যতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । অম্বরীষ, হরিশচন্দ্র, মান্ধাতা, মনু, কুরু, কনখল, সগর, নচিকেতা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত তাহা শুভ মানবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ।

যদিও ত্রিলোকের তীর্থগুলিকে পবিত্র বলে মানা হয়,তথাপি জম্বুদীপের তীর্থগুলিকে অতিশয় ফলদায়ী বলা হয় । ভারতবর্ষের তীর্থগুলি ত্রিভূবনের তীর্থসকল থেকে প্রসিদ্ধ বলে মানা হয় ।

ভারতভূমি কর্মভূমি ।এখানে শুভাশুভ কর্ম,মানুষকে সুখদুঃখ প্রদান করে থাকে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভগবান বিষ্ণু ও মহাদেব মানুষের তীর্থ-গুলিতে বাস করেন এবং মানুষের ক্লেশ দূর করার জন্য কেশব ভারতের তীর্থ গুলিতে বাস করে থাকেন । একথা সত্য যে, সমস্ত ভূ-ভাগই তীর্থস্বরূপ ।

তীর্থের বৈশিষ্ট্য।

ব্রহ্মপুরাণ-এ লিখিত তীর্থ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে, সত্যযুগে যেমন অল্প নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারাই নিজেকে শুদ্ধ করা হতো,অল্প পরিশ্রমেই অভীষ্ট সাধনে সাফল্য লাভ করাটা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যেত -তীর্থ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

দেবীপুরাণ - এখানে লেখা আছে, মানুষের মধ্যে যে সমস্ত আবরণ, মল, বিক্ষেপ থাকে, সে সমস্তই তীর্থস্থানে উপবাস, দান, জপ, হোম, যজ্ঞ এবং ভগবানের অর্চ্চণার দ্বারা দূর হয়। যে সমস্ত মানুষ নিয়মিত তপ, জপ,পূজা-পাঠ ইত্যাদি করতে না পারে, তবে মাঝে মাঝে তীর্থাদিতে গিয়ে যদি স্নান বা দেব-দেবী দর্শনও করে, তবে তাদের ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভাগবত মহাপূরাণেও উপরোক্ত বিষয়ে উল্লেখ আছে।

বস্তুতঃ পুরাকাল হ'তে ব্যাপক তীর্থের মর্য্যাদা রক্ষা পাচ্ছে। জৈন সম্প্রদায়ে 'তীর্থঙ্কর'বলে যা উল্লেখ আছে তা তীর্থের প্রতি গভীর মর্য্যাদাই প্রকাশ পায়। তীর্থে গেলে মানুষের বিক্ষিপ্ত মন অনায়াসেই শান্ত হয়। সাধারনতঃ দেখা যায় তীর্থের বায়ু, জল, প্রধানতঃ বিশুদ্ধ থাকে। এমনকি সাধু-মহাত্মাগণ বাস করাতে ঐ সকল তীর্থের অণুপরমানুগুলি শুদ্ধ থাকে। তীর্থে মানুষের মন শান্ত হয়ে শুভ ভাবনার উদয় হয়।

মহাভারত গ্রন্থে পরাশর মুনি তীর্থাদিতে গিয়ে জপ-তপ পূজাদি করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে চিত্ত শুদ্ধি হয়ে দেহ-মন-প্রাণ পবিত্র হয়। তীর্থে দান, স্নান,তপস্যাদি শুভ ফল প্রদান করে থাকে।

নৈমিষারণ্য -তীর্থরূপে মর্য্যাদা অতি প্রাচীনকাল হতেই সমাদৃত হয়ে আসছে। বৈদিককাল হতে - রামায়ণ এবং মহাভারতকাল পর্য্যন্ত এক পাবন তীর্থরূপেই বর্ণিত হয়েছে। শৌনকাদি ঋষিগণ বৈদিককাল থেকেই তপস্বীরূপে তপচর্য্যা করতেন। ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরাম এবং দ্বাপরযুগে শ্রীবলরাম ও পান্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের পূর্বে এই নৈমিষারণ্য তীর্থেই অবস্থান করেছিলেন। এখানেই রাজা মনু ও শতরূপা পুত্র লাভের জন্য তপস্যাদি, দান করেছিলেন। নৈমিষারণ্যকে দেবতীর্থ রূপে মানা হয়। কারণস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মার মনোময় চক্র এই নৈমিষারণ্যতে অবস্থান করার ফলে ৮৮ হাজার মুণি-ঋষিগণ এখানেই বসবাস করতেন। এই অঞ্চলটিই তপস্যার যোগ্যভূমি।

৺ আনন্দময়ী ও পুরাণ মন্দির। ৺

মা আনন্দময়ীর নাম নৈমিষারণ্যের সন্ত-মহাত্মাদের ভিতর স্বর্ণাক্ষরে লেখা যায়। মা যখন থেকে নৈমিষারণ্যতে এলেন, তখন থেকেই নৈমিষারণ্য আবার জেগে উঠলো। তাঁর বিভূতিতে পৌরাণিক স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে লাগলো, দেশ-বিদেশের সাধু-মহাত্মাদের পুনরায় আর্বিভাব ঘটলো। তিনিই পুরাণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মুনি ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধার বেগ বাড়িয়ে দিলেন। পুরাণ মন্দিরের ভিতর পুরাণগুলি সংরক্ষিত হলো ও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই পুরাণ মন্দিরের মুর্ত্তিটী অষ্টধাতুর এবং শিল্প কলায় সমৃদ্ধ ও নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। নানা মুদ্রায় প্রানবন্ত। প্রাচীন চিন্তাধারার স্রোত নতুনভাবে প্রভাবিত করে দিলেন। মূর্ত্তিটি বিশেষ তাত্ত্বিক পর্যায়ের একথা অনস্বীকার্য। কারণ শিরোদেশ 'তোতা' পাখীর সাথে তুলনীয় এবং মূর্ত্তিটির দেহ মানব দেহ। হাতে অক্ষমালা, যজ্ঞসূত্র। এই বৈচিত্র্যময় মূর্ত্তিটি ভারতের কোথায়ও দেখতে পাওয়া যাবে না বলেই আমার একান্ত বিশ্বাস। অথচ শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম। উপরন্তু, এই মূর্ত্তিটি উপলক্ষ্য করে স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ত যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনি ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন, উচ্চকোটীর সাধু-সন্তের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা উৎসবটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে ছিল।

এমনকি আমি স্বচক্ষে দেখেছি বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু শাস্ত্রজ্ঞ, কথক ও কীর্ত্তনীয়া, গায়কও এসেছিলেন। মায়ের একান্ত অনুগতা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন এখানে ছিলেন। শেষপর্বে মা নিজেই নিজের হাতে তুলসীবেদী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেদিন অনেকগুলি খোল নিয়ে কীর্ত্তনও করা হয়েছিল।

মা আনন্দময়ী সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলেন, সেজন্য সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তের ও ভক্তদের ভীড় লেগেই থাকতো। ভারতের প্রায় সর্বত্রই তিনি তাঁর ধর্মধ্বজা উড়িয়ে ছিলেন এবং প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। নৈমিষারণ্যে প্রাচীন মুনি ঋষির চিন্তাধারা কিছুটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মা আনন্দময়ীর আগমনে ও সাধন প্রচেষ্টায় পুনঃরায় নৈমিষারণ্য উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। কলিযুগে সাক্ষাৎ দেবীরূপে নিজেই ধর্মসংস্থাপনা করে গেলেন। ১৯৮২, ২৭শে আগষ্ট দেরাদুনে ব্রহ্মলীন হলেন।

নৈমিষারণ্যের দর্শনীয় স্থান ।

হনুমান গড় -- হনুমানজীর এই প্রাচীন মন্দিরটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু ভূমির উপর অবস্থিত । এটি অতি প্রাচীন মন্দির । বর্তমানে এখানে কোন আশ্রম বা কোন শিক্ষার্থী নেই, কিন্তু ৬ -৭ শত বছর আগে এখানে অনেক সাধক ও শিক্ষার্থী বাস করতেন, তার নিদর্শন আজও বর্তমান । দর্শনার্থীদের দানের উপরেই এ-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষনের খরচ চলে ।

নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী এখানে পূজাদি হয়ে থাকে । এই মন্দিরকে প্রদক্ষিণের বিধি আছে । মন্দিরের নানাস্থান থেকে নৈমিষারণ্যের প্রাকৃতিক শোভা খুবই মনোরম দেখায় । বর্তমান সময়ে নতুন করে ৩ -৪ বৎসর হলো সুন্দর সংস্কার হয়েছে ।

যজ্ঞ বরাহ কূপ --কথিত আছে প্রাচীন কালে শ্রী বিষ্ণু,বরাহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । পান্ডবগণ নৈমিষারণ্য বাসের সময়,এই কূপের জল দিয়ে দৌপদী রান্না করেছিল,দুর্ব্বাসা মুনির সকল শিষ্যদের সঙ্গে তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার সাথে ভোজন করিয়েছিলেন এবং মহামুনি দুর্ব্বাসাও খুবই তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করেছিলেন । এই স্থানের পাশেই গোমতী নদী ও পান্ডবকিলা নামে পরিচিত স্থানটি আজও দেখতে পাওয়া যায় । এই কূপটির বহু বার সংস্কার করা হয়েছে । শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ীর পুরাণ মন্দিরের পাশেই । তাছাড়া প্রায় ৯৫ গজ দূরে একটি প্রাচীন গুহা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে । গুহাটির ভিতর আমি ঢুকে ছিলাম, ভিতরে প্রায় ৫০-৬০ ফুট । বর্তমানে মাটীর ধ্বস নেমে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে ।

পুরাণ মন্দির --যখনই কোন ধর্মস্থানের শক্তি হ্রাস হয়,তখনই সেখানে অলৌকিক শক্তির আর্বিভাব ঘটে । শ্রীশ্রী মায়ের নৈমিষারণ্যে আগমনও অনেকটা সেইরূপ । তিনি যে নানা বিভূতিসম্পন্না ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য । তাঁর নৈমিষারণ্যে প্রথম পদার্পণের সময় - সীতাপুরের নারায়ণ সায়গলজীর নৈমিষারণ্য আশ্রমেই । ওখানে টীনের ঘরে বাস করতেন । গোমতীর ধারেই নানা প্রকারের ফলের গাছ ঐ আশ্রমে ছিল । এখানেই বড় একটি বটগাছের তলায় সিমেন্ট বাঁধানো স্থানে বসে থেকে গোমতী নদীর ধারেই সকাল বিকাল ময়ূরদের নৃত্য দেখতেন । ঐ আশ্রম থেকে বহিরাগত সমস্ত সাধু-সন্তদের দুবেলা অন্নদান করা হোত,

থাকবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট কুটীর ছিল। ২টি গুহাও ঐ আশ্রমে সংরক্ষিত ছিল। ঐ আশ্রমের কুটীরেও নারায়ণ সায়গলজীর সৌজন্যে গুহাতে বাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সায়গলজীর অন্নক্ষেত্র আশ্রমেই ছিলাম কারণ, সেই সময় পুরাণ মন্দিরের অতিথিশালা সম্পূর্ণ তৈরী হয় নি।

শ্রী শ্রী মায়ের ইচ্ছাতে ও ভক্তদের আগ্রহে খুব অল্পসময়ের মধ্যে ওখানকার মন্দির গড়ে ওঠে। ঐ মন্দিরটির নামাকরণ হয় "পুরাণ মন্দির" নামে। ওখানে সমস্ত পুরাণ গ্রন্থ ও ৪ টি বেদ রাখা হয়েছে এবং ঐ গ্রন্থগুলোকে নিত্যপূজার ব্যবস্থা এখন অবধিও আছে, প্রধান বিগ্রহ পুরাণপুরুষ বা পুরাণস্বরূপ বা বিদ্যা দেবতা, মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে ব্যাসদেব ও শুকদেবের মূর্ত্তিও রয়েছে। মন্দিরের ভিতরে পুরাণ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির সন্মুখেই, বিশেষ ধরনের কাঠের সুন্দর মঞ্চের মধ্যে সমস্ত পুরাণ গ্রন্থগুলি ও ৪টি বেদ সুসংরক্ষিত ভাবে লাল কাপড়ে ভালোভাবে রাখা আছে। এই মঞ্চ প্রদক্ষিণের জন্য মন্দিরের ভিতরে জায়গা করা আছে। সব তীর্থ যাত্রীরাই এই মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে পারেন। এই পুরাণ মন্দিরের অতিথিশালার পেছনেই একান্তে সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে একটি ঘর গুহাকারে তৈরী আছে, ওখানে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই পুরাণ মন্দিরের সীমানার বাইরে (সংলগ্ন) পুরাতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা সংরক্ষিত বড় শিলাস্তম্ভ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পুরাকালের ঐতিহাসিক সাক্ষী। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। শ্রীশ্রী মায়ের পুরাণ মন্দিরের পিছনের জঙ্গলের ভিতর প্রাকৃতিক ভাবেই একটি একান্ত গুহা আছে। এ সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। এ অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই বহু পুরাতন পাথরের ব্যবহার ও নিদর্শণ পাওয়া যায়, অথচ আশে-পাশে কোন পাহাড় নেই।

অক্ষয়তৃতীয়া ১৯৭৫ সালের ১৪ ই মে এই পুরাণ মন্দিরে পুরাণদেবতা বা বিদ্যাদেবতা বা পুরাণ পুরুষের প্রতিষ্ঠা হয়। মূর্ত্তিটী তত্ত্ব সম্বলিত এতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের কোথাও একপ্রকারের মূর্ত্তি দেখা যাবে না। মূর্ত্তিটি অষ্টধাতুর, কলকাতার গরাণহাটার শিল্পী হারাণ সরকারের দ্বারা নির্মিত। মুখাকৃতি তোতা পাখীর মতো। একহাতে অঁক্ষমালা,অন্যহাতে অভয়মুদ্রা, পদ্মাসনে বসে আছেন পায়ে বহু প্রকারের অলঙ্কার।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের অনুরোধেই শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীধামের সংগ্রহশালায় রাখা এক মূর্ত্তির আদর্শেই এই পুরাণ পুরুষের মূর্ত্তিটি পরিকল্পিত হয়েছে। এই মূর্ত্তিটি কাশীর রামেশ্বর পন্ডিত সব পুরাণশাস্ত্র খুঁজে মূর্ত্তির বিবরণ সংগ্রহ করে পটে আঁকান। সেই থেকে এই মূর্ত্তি আদি নারায়ণ বলে আখ্যায়িত, এমনকি পুরাণ জ্ঞানরূপী স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ। ৭দিন ব্যপী প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত ছিলেন হৃষীকেশের কৈলাস আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতীজি,বৃন্দাবনের স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতীজি, হরিদ্বারের স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতীজি এবং স্থানীয় মহামন্ডলেশ্বর স্বামী নারদানন্দ সরস্বতীজি, বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ সরস্বতীজি(নারদানন্দ আশ্রম) এছাড়াও দেশ বিদেশের বিদগ্ধ ভক্তগণ। প্রতিদিন ভাগবত পাঠ ও সৎসঙ্গাদি এবং ভান্ডারাদি নিয়মিত ভাবে ভোর থেকে রাত্রি ৯টা অবধি চলেছিল।

পুরাণ পুরুষের প্রতিষ্ঠা উৎসবের শেষ পর্বে বিকাল বেলায় মাঁ আনন্দময়ী মন্দিরের সম্মুখে তিনটি তুলসী বেদীতে হরি সংকীতর্ণের মাধ্যমে তিনটী তুলসী গাছ নিজের হাতে লাগান এব্ং হরিলুট ও ফল প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। সুগায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মাতাঠাকুরানী ঐ উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন।

পান্ডব কিলা-শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ীর পুরাণ মন্দির ও হনুমানগড়ের মাঝামাঝি স্থানটিতে অবস্থিত এই পান্ডবকিলা। পূর্বে গোমতী নদী -এর পাশেই ছিল, কিন্তু এখন কিছুটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পান্ডবদের দূর্গ এখানে ছিল,রাজা পরিক্ষিৎ-এর সময়েও এই স্থানটি তাঁর অধীনেই ছিল।

শ্রী নরসিংহ মঠ-এটি রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠ। বিভিন্নদেশের ঐ সম্প্রদায়ের সাধক ও ভর্ক্তগণের আশ্রয়স্থল। এই মঠের দ্বারা পরিচালিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় এখনও বর্তমান।

চক্রতীর্থ - মুনিঋষিদের ও তপস্বীগণের প্রার্থনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মার নির্দেশে -"মনোময় বিষ্ণু চক্র" এখানে পড়ে এবং প্রচন্ড বেগে মাটির নিচে প্রবেশ করে। সেজন্য মাটির নিচ থেকে জল উঠে প্লাবনের আকার ধারণ করে। পুনঃরায় ত্রিপুরেশ্বরী দেবী বা ললিতা দেবীর করুনাতেই জলধারা শান্তরূপ নেয়। এখনও

ধীরগতিতে জল ধারা দিবারাত্র প্রবাহিত হয় । গোমতী নদীর থেকে প্রায় ১/২ মাইল দূরে । প্রায় প্রত্যেক তীর্থযাত্রীই এই স্থানে স্নান করে এবং পিন্ডদানবিধি আছে । এই গোলাকার -জলময় স্থানটির চারদিকেই মন্দির ও মূর্ত্তি আছে । প্রত্যেক অমাবস্যা তিথিতেই অগণিত যাত্রীর ভীড় হয় । তবে যখন সোমবারে অমাবস্যা তিথি হয় তখন তীর্থ যাত্রীর ভীড় দ্বিগুণ হয় । প্রত্যেক বছর ফাল্গুন মাসেই শিবরাত্রী থেকে দোলপূর্নিমা পর্যন্ত তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখা যায় ।

ত্রিপুরেশ্বরী বা ললিতাদেবী –এখানে সকাল ও বিকাল বেলায় জগদম্বা বা জগদ্ধাত্রী দেবীর নিত্যপূজা হয় । সন্ধ্যাবেলায় আরতি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ । বিশেষ বিশেষ তিথিতে হোমযজ্ঞের ব্যবস্থা বা বিধি আছে । সকলের কাছে নৈমিষারণ্যের এই স্থানটি খুবই মাহাত্মপূর্ণ স্থান । লৌকিক ও পারমার্থিক ফল প্রদায়িনী "মা" বলে প্রচলিত । স্থানীয় বাসিন্দাগণের কাছে "লালতামাইয়া " বলে পরিচত । এখানকার হোমের আগুণ কখনই নির্বাপিত হয় না,তাই এটি অখন্ড অগ্নিজ্যোতি ।

ব্যাসগদ্দী – মহর্ষি পরাশরের পুত্র ব্যাসদেবের প্রধান কীর্তি এ-স্থানেই, চার বেদের বিভাজন ১৮টি পুরান্, ১৮টি উপপুরাণ, ১৮টি মহপুরাণ ও উত্তর মীমাংসা এখানে বসেই লিখেছিলেন । গোমতীর ধারে বড় যজ্ঞশালা ও বিশাল বটবৃক্ষ এবং শান্ত পরিবেশ প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করেছে বলে মনে হয়,খুবই অনাড়ম্বরপূর্ণ স্থান । সর্বশেষে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত লিখে নিজে খুবই তৃপ্তি লাভ করেন ।

মনু ও শতরূপা –রাজা মনু ও রানী শতরূপা এখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তপস্যা করেছিলেন । ব্যাসগদ্দীর সংলগ্ন চিহ্নিত স্থানটীই এঁদের তপস্যা স্থল । মানব জাতির সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মকানুন. মনুসংহিতাতে লেখা আছে ।রাজা ও রানী পুত্র সন্তান লাভের জন্য দীর্ঘ বৎসর তপস্যা করেছিলেন ।

দশাশ্বমেধ ঘাট – বাল্মিকী রামায়ণ থেকে জানা যায়, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব এবং অন্যান্য ঋষিমুনিদের নির্দেশক্রমে শ্রীরামচন্দ্র নৈমিষারণ্যতেই অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞের বাবস্থা করেন । সমস্ত যজ্ঞের ভার ভরতের উপর ছিল । সীতার অভাবহেতু স্বর্ণদ্বারা সীতা প্রস্তুত করে যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করা হয় । এই যজ্ঞানুষ্ঠানে লব ও কুশ সহ মহামুনি বাল্মিকী উপস্থিত ছিলেন । এমনকি যজ্ঞের পর বাল্মিকীমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ শোনানোর জন্য লব-কুশকে নির্দেশ দিলেন । রামায়ণ শোনার

পর শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিত হলেন যে; সীতাদেবী জীবিত আছেন তখন মহামুনি বাল্মিকীজিকে সীতাদেবীকে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ জানালে বাল্মিকীজি - সীতাদেবীকে নৈমিষারণ্য নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে পৃথিবী বা ধরিত্রী মাতার নির্দ্দেশে তাঁর সাথে সিংহাসনে বসে সেস্থানে সমাহিত হন,সেই স্থানটি সীতাকূপ বা সীতাকুন্ড নামে অভিহিত। এই স্থানটি নৈমিষারণ্য থেকে প্রায় ৪ মাইলদূরে - মিশ্রিখ্ নামক স্থানে -দধীচি কুন্ডের কিছু দূরেই। এখন উৎসাহীগণ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। আমার ঐ স্থানটি খুবই প্রিয় তাই,তিনবার গিয়েছিলাম্। নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার সময়ও এই স্থানটি পড়ে।

<u>আপা নারায়ণ</u> –কাশী কুন্ডের পশ্চিমদিকে তাঁর সমাধি আছে। তাঁকে আমি দেখিনি, শুনেছি ইনিও একজন সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তাঁর ভিতর অপরিসীম যোগশক্তি ছিল। তাই জীবিত অবস্থাতেই সমাধি নিয়েছিলেন। এখনও ঐ সমাধিতে মানত্ করলে সুফল ফলে।

<u>মৌনীবাবা</u> –কোন সময়ই কথা বলতেন না। বেশীর ভাগ সময় অযোধ্যাতেই কাটিয়েছেন। ওখানে তিনি বিশাল মন্দির বানিয়েছেন। ইনি যজ্ঞকে বিশেষ প্রধান্য দিতেন। তাঁরও যোগশক্তি ছিল।

<u>নাগাস্বামী</u>–প্রায় ৬৫ বছর পূর্বে নৈমিষারণ্যতেই থাকতেন। ইনি যোগক্রিয়ার দ্বারা অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করতেন। তার কোন প্রকার ইচ্ছাই ছিল না, একেবারে অনাসক্ত পুরুষ তাই পরমাত্মায় একনিষ্ঠ ছিলেন। শীত-গ্রীষ্মে কোনরূপ বস্ত্রাদি পড়তেন না। সেজন্য নাগাস্বামী নামেই তিনি এখানে পরিচিত ছিলেন। তাঁর থাকবার কোন সঠিক জায়গা ছিল না। কখনও গোমতীর বালুর চড়ে থাকতেন, আবার কখনও জঙ্গলে, আবার কখনও গোমতীর জলে ভাসতে দেখা গেছে। কারও কাছে কিছু চাইতেন না।

<u>স্বামী নারদানন্দ</u> –তিনি জীবিত থাকাকালীনই তাঁর আশ্রমের স্বর্ণকুটিরে তাঁরই প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সরস্বতীর পাশের ঘরে বহুমাস কাটিয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে নিয়ে সাহারানপুর সৎসঙ্গ ভবনের অনুষ্ঠানে গেছেন,ঋষি-আশ্রমেতে সরাসরি প্রাইভেট মোটরগাড়ীতে এমনকি হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভতে। নারদানন্দের শরীরটা তখন অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তিনি উগ্রতপস্বী ছিলেন। কোনরূপ

আড়ম্বড় ছিল না । তার নামেই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত । দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে ১/২ মাইল, ইনি বহুসংখ্যক ভক্তকে ধর্মপথে আশ্রয় দিয়েছেন । নৈমিষারণ্য তপোভূমিকে পুনঃরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগ্রহী ছিলেন । বর্তমানে ঐ আশ্রমেতে বহু তপস্বী আছেন । এখানে ঋষিকুলের ধারানুসারে আশ্রম পরিচালনায় চতুরাশ্রম মানা হয় । যেমন ব্রহ্মচর্য্য, গ্রার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস । এখানে আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৮টি যজ্ঞবেদী, ১০৮টি গোশালা ও ওষুধালয় আশ্রমবাসীদের জন্য বর্তমান ।তাছাড়া বিশাল দেবমন্দির আছে,যাতে সমস্ত প্রকার দেবতার মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় । নারদানন্দজী কনৌজের মকরন্দ নগরের কান্যকুব্জ পরিবারে জন্মেছিলেন । পিতা - বুদ্ধসেন, পিতামহের নাম ছিল - বুলাকীদাস । পিতামহ পরবর্তীতে মিয়াগঞ্জে গিয়ে বাস করেন এবং ওখানে একটি শিব -মন্দির স্থাপন করেন । পিতামহের সঙ্গে প্রতিদিন যাবার ফলে দেব-দ্বিজে ভক্তি জন্মে ফলে সংস্কার পুষ্ট হতে থাকে । তার আদর্শ ছিল মানুষকে ভক্তির মাধ্যমে ত্রি-তাপ জয়ী হতে হবে । তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এসে এ-ভূমির জন্য কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ডের প্রভুত উন্নতি করেছেন । ১৯৮৪-র নভেম্বরে তিনি দেহ রক্ষা করেন ।

বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির-মুনি-ঋষিদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কাঁশীধামের বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা নৈমিষারণ্যে প্রকটীত হয়েছিলেন, এজন্য এই মন্দিরের এরূপ নামাকরণ হয়েছে ।

সুতগদ্দী —ভারতের তপস্বী, মুনি -ঋষিদের মতো সূত গোস্বামীজির নামও উল্লেখযোগ্য । তাঁর সাধন-তপস্যার ঐতিহ্য ও চিহ্নস্বরূপ মন্দির এ অঞ্চলেতে আজও শোভাবর্দ্ধন করছে । এ-স্থানটি চক্রতীর্থের কাছেই ছোট পরিবেশে স্থান পেয়েছে ।

সূত গোস্বামীজীর অপর নাম লোমহর্ষণ সূত । তাঁর বাবা ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং মাতা ব্রাহ্মণ বংশের । পূর্বে ব্রাহ্মণ না হলে বেদ চর্চার অধিকার ছিল না ।নিজগুণে ও শিক্ষায় গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করেন এবং গুরুদেবের নির্দেশ ক্রমে ব্রহ্ম-সূত্র এবং পুরাণাদির ব্যাখ্যা লিখেছিলেন । গুরুদেব ব্যাসদেব তাঁর জ্ঞানের ও প্রবচনের প্রতিভা শ্রবণ করে, সকলের ভিতর শাস্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্য বলেছিলেন । সেজন্য সূত গোস্বামীজী নৈমিষারণ্যে সকল মুনি-ঋষিদের কাছে বেদভাষ্য, পুরাণাদির তত্ত্বাত বিষয়বস্তু পাঠ ও বক্তৃতার মাধ্যমে দান করতেন । ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি অকাতরে সরল ভাষায় টীকা সহ ব্যাখ্যা করতে পারতেন । সূতগদ্দীর নিকটে মহাঋষি শৌনিকের যজ্ঞশালাতে শৌনিক ঋষি ১০০ বৎসর অহোরাত্র যজ্ঞ করেছিলেন ।

<u>মহারাজা মনু ও শতরূপা</u> —ব্যাসগদ্দীর পূর্বদিকে উভয়ের তপস্যাস্থল এখনও বিদ্যমান। পদ্মপুরাণে আছে যে, বিষ্ণু স্বয়ং তাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিশ্রুতি ও বরদান করেছিলেন যে,বিষ্ণু নিজে তাঁদের পুত্ররূপে জন্মাবেন। মনুর লেখা "মনু সংহিতা"অনুসারে আমাদের বিবাহাদি ও শ্রাদ্ধাদি এখনও হয়ে চলেছে।

<u>বল্লভাচার্য্যের মন্দির</u> —বৈষ্ণবাচার্য্য বল্লভাচার্য্যজী এ-ভূমিতে বাস করতেন। এই নৈমিষারণ্য তপোভূমি থেকে ভাগবত জীবনের মূল উপাদান লাভ করেছিলেন। সেজন্য তার নামে মন্দির স্থাপিত হয়। পশ্চিম বাংলায় আউলিয়া সম্প্রদায়, কল্যাণীর সতীমাতার মন্দির - আচার্য্য বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়। রাজস্থানে বল্লভাচার্য্যের প্রাধান্য বেশী।

<u>শ্রী পরমহংস মঠ</u> —এখানকার বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ,সকাল সন্ধ্যায় খোল করতাল দিয়ে কীর্ত্তন করা হয়। আমি ১৯৭৪ সালে যখন এ মঠে থাকতাম তখন - শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মাটীর মূর্ত্তি শোভা পেত। দর্শনার্থীদের ভীড়ও বেশী ছিল। ভক্তি বিলাসতীর্থ মহারাজ দ্বারা পরিচালিত। তাঁর দেহরক্ষার পর থেকে এ মঠটি সর্বদিকেই ক্ষীণ হয়ে গেছে,আর মূর্ত্তির প্রদর্শনী হয় না। এ মঠের পরিচালন — দান এবং কিছু ভক্তের উপর নির্ভরশীল। স্টেশনের সন্নিকটে এই মঠটি অবস্থিত। এখানকার মহন্ত ছিলেন - নারায়ণ স্বামী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অধীন।

<u>মিশ্রিত তীর্থ বা মিশরীক্ষ তীর্থ</u>—নৈমিষারণ্য থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। নৈমিষারণ্যের ৮৪ ক্রোশ (১৬৮-মাইল) পরিক্রমা শিবরাত্রির পর প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু করে ১০ দিন ব্যাপী গ্রামাঞ্চলের পথ ধরে পায়ে হেঁটে চলতে হয়। একসঙ্গে প্রায় ৫ হাজার তীর্থযাত্রী ভোর ৪ টার সময় প্রতিদিন পরিক্রমা যাত্রা শুরু করে বেলা ১২টার সময় গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে আহারাদি-বিশ্রাম-সৎসঙ্গাদি ও রাত্রি-বাস এভাবে ১০ দিন কাটানোর পর আবার নৈমিষারণ্যতেই ফিরে আসে। ওখানে রাত্রিবাসের পর পুনঃরায় মিশরীখ তীর্থের উদ্দেশ্যে পরিক্রমা শুরু হয়, এই পরিক্রমা গোমতী নদীর ধার দিয়েই যেতে হয়, তবে ছোট ছোট কয়েকটি নালা অতিক্রম করাই কষ্টসাধ্য।

নৈমিষারণ্য ৮৪ মাইল পরিক্রমার যাত্রীরাই শুধু মিশরীক্ষ যাওয়ার সময় অধিকাংশ হাঁটাপথে না গিয়ে বাসপথে বা পাকা রাস্তা ধরেই মিশরীক্ষ তীর্থে পৌছায়, কারণ

হাঁটাপথ অনেকটাই দূর ও কষ্টসাধ্য কিন্তু, প্রকৃত ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করতে যাঁরা যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা হাঁটাপথ ধরেই মিশরীক্ষ তীর্থে পৌছায় । হাঁটাপথে চলার পরে অনেক গুলি প্রাচীন তীর্থস্থানও দর্শন হয় । এখানকার গ্রামবাসী খুবই শ্রদ্ধাশীল ও সেবাপরায়ণ । আমি কষ্ট স্বীকার করেই নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা হাঁটা পথেই করেছিলাম,তাই যে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী তীর্থযাত্রী অনেক বার নৈমিষারণ্য গেছেন কিন্তু তাঁরা অধিকাংশই নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করেননি, এবং নৈমিষারণ্য থেকে মিশরীক্ষ যাওয়ার হাঁটাপথে যে সব প্রাচীন স্থান ও গুহাসমূহ পড়ে সেগুলি দেখেনি,তাঁদের জ্ঞাতার্থে নামগুলি প্রকাশ করছি । যেমন - রামেশ্বর মন্দির, জগন্নাথদেবের মন্দির, বদ্রীনারায়ণের মন্দির (বৈঠরী) ইত্যাদি ।

কথিত আছে - প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিগণ নিজেদের তপস্যাবলে উপরোক্ত তীর্থাদি দর্শন ও মাহাত্ম্য স্থাপনা করে গিয়েছেন । এমনকি এইসব স্থান এখনও পুনঃপুনঃ সংস্কার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়নি । প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানগুলি সত্যই খুবই মনোরম এবং ঐতিহ্যপূর্ণ কারণ, এখানে তপস্বী ও মুনিঋষিগণের মাধ্যমে শক্তি সম্পাদিত আছে । মিশরীক্ষ রেলস্টেশন থেকে মহামুনি দধীচির আশ্রম ও কুন্ড প্রায় ১০ মিনিটের রাস্তা । দর্শনীয় স্থানের ভিতর দধীচির মন্দির কুন্ড বা প্রকান্ড দীঘি এবং সীতাকুন্ড । নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার পর ৫ দিন ধরে এই মিশরীক্ষ তীর্থে মেলা বসে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধু-সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হয়ে প্রায় ১০০ তাঁবু খাটিয়ে থাকেন এবং সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় পাঠ-কথা এবং প্রবচনের মাধ্যমে হিতোপদেশ দিয়ে থাকেন । অনেকগুলি অন্নক্ষেত্রও খোলা থাকে । বহু প্রকারের ব্যবস্থা সংস্থার বড় বড় ষ্টল ও দোকান বসে । স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের এবং বিভিন্ন শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা এখানে শুধু ৬দিনের জন্য উপস্থিত থাকেন । প্রায় দেড়লক্ষ তীর্থার্থী ও দর্শনার্থীর ভীড় হয় । এই মেলা পরিচালনার ভার উওরপ্রদেশ গভর্ণমেন্ট এবং স্থানীয় পৌরসভার যৌথ উদ্যোগেই হয়ে থাকে । তাদের অনেক নূতন নূতন অফিস খোলা হয় । নিত্য প্রয়োজনীয় কুটীর শিল্পের অফুরন্ত সমাবেশ - মাটীর,কাঠের,লোহার দ্রব্যাদি,নানাপ্রকারের মেশিন,বস্ত্রসম্ভার ইত্যাদি । বিভিন্ন প্রজাতির হাজার গরু, মোষ কেনা বেচা হয় ।

<u>সীতাকুন্ড</u> – কিংবদন্তি আছে যে, মহামুনি বাল্মিকীর আশ্রম এখানেই ছিল । এমনকি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশ এখানেই থাকতেন । দশাশ্বমেধ যজ্ঞের সময় মহামুনি বাল্মিকী নৈমিষারণ্যতে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে লব ও কুশের দ্বারাই রামায়ণ শুনিয়ে ছিলেন ।

এমনকি মহামুনি বাল্মিকী সীতাদেবীকে এখানেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই কুন্ডের পাশে এখনও মহামুনি বাল্মিকীর নামে আশ্রমের নামাকরণ হয়েছে। সব পুন্যার্থীই এখানে স্নান করে থাকেন। এমনকি, পূজা পাঠের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। স্থানটি একান্তে অবস্থিত। মেলা চলার সময়েও এই স্থানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ধ্যান - ধারণার উপযুক্ত স্থান।

মেলার আগে ও পরে বহু তপস্বীই এখানে এসে তপস্যা করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। তবে এই তীর্থে কয়েকদিন থেকে আপন-আপন সাধনানুসারে সাধন করলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যাবে।

নৈমিষারণ্য ভারতীয় অধ্যাত্মিক উৎসের প্রাণকেন্দ্র একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রাচীন ভারতের বিদ্যা-শিক্ষার প্রাণবিন্দু। এতো মহাপ্রাণের একসঙ্গে আর্বিভাবই এ-ভূমির উৎকর্ষতার কারণ। এখানকার গোমতী নদীটি উওর বাহিনী। কাঁশীধামের গঙ্গাঁও উত্তর বাহিনী। সুক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে উত্তর বাহিনীর নিশ্চয়ই সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হয়েছে।

আমি ১৯৭৪ সালে নৈমিষারণ্যতে প্রথমে যাই,আমার সবচেয়ে ভাল লাগতো - চক্রতীর্থ,ব্যাসগদ্দী ও গোমতীর তট। সকাল-সন্ধ্যায় গোমতীর তীরে অসংখ্য ময়ূর জমায়েত হতো, ওদের ঝগড়া করতে কখনও দেখেনি ! বিশেষতঃ ওখান থেকে প্রতিদিন উড়ে যাবার দৃশ্যটি খুবই আনন্দ দিত। রাত্রি ৩ -৪ টার সময় ওদের পাখার সমবেত শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেত, মনে হতো পাখার ঝাপটানি হচ্ছে ওদের ব্যায়াম। রাত্রির অলসতা ও পাখাকে সজীব করার বা রাখার কৌশল। ভোরবেলায় একসঙ্গে দীপ্রস্বরে, দূর থেকে ওদের কলরব শুনে মনে হতো বেদগানের ঐক্যতান। ময়ূর যখনই পেখম তোলে তারপড়-ই ঝির-ঝির শব্দে ঘুরে ফিরে চেয়ে দেখে, কোন আক্রমণের আশঙ্কা আছে কিনা। পেখম মেলে ১৫-২০ মিনিট থাকতে পারে। ময়ূরীরা ময়ূরের একান্ত বাধ্যগত হয়। ওরা সকাল সন্ধ্যায় জল খাবার জন্যই গোমতীর পাশে আসে। অন্যসময় কখনও দেখিনি। বড় বড় গাছের উপর বাসা বেঁধে থাকে। সন্ধ্যা হবার পূর্বেই বাসায় চলে যায়। ময়ূর ৪০০ - ৫০০ গজ উড়তে পারে। ময়ূরের পেখমের চেয়েও, পেখম মেলার পর যে তালযুক্ত ঝির্-ঝির্-ঝির্ ধ্বনি - ভাল লাগে। তার চেয়ে আরও আনন্দ দেয় উড়ন্ত ময়ূরকে দেখতে। ময়ূরদের প্রধান খাদ্য সাপের ডিম ও মাংস। প্রাচীন জায়গাতেই এদের দেখা যায়। জাতীয় পাখিরূপে ময়ূরকে গণ্য করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় একমাত্র ময়ূর পুচ্ছই স্থান পেয়েছে। এর কারণস্বরূপ,"কাম জিৎ"বলা যায়। বৈষ্ণব-তন্ত্রতে -- ময়ূর পুচ্ছের চোখকে ব্রহ্মযোনি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

❋ নৈমিষারণ্য তপোভূমির ৮৪ ক্রোশ(১৬৮মাইল) পরিক্রমা ।❋

৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমা প্রত্যেক ফাল্গুন মাসের শুক্লা প্রতিপদে অতি প্রাচীনকাল থেকেই "চক্রতীর্থে"স্নান সমাপন করে ললিতাদেবী বা লালতামাতার মন্দির দর্শন করে স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও বহিরাগত বহু সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্তদের সাথে পদব্রজে, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, পাল্কী প্রভৃতি নিয়ে নিজ-নিজ অবস্থা অনুযায়ী এই পরিক্রমায় যোগদান করেন । নৈমিষারণ্যের বাম পার্শ্ব থেকে এই পরিক্রমা শুরু হয় । এমনকি, হাতী ও উটের উপস্থিতিও অস্বীকার করার উপায় নেই ।

অধিকাংশ দোকানপত্র সাইকেল যোগেই যোগদান করে । সাথে সাথে সার্কাস প্রভৃতিও চলে । প্রায় তিন চার লক্ষ পূন্যার্থী ও দর্শনার্থী ভক্তগণ নানা বেশে, নানারূপ নামগান,জপ,স্মরন-মনন করতে করতে এই পরিক্রমার পথ আনন্দে অতিক্রম করেন । অধিকাংশ যাত্রীই সকাল বেলাতেই নৈমিষারণ্য হতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন ।

পর্যটনের পথে কিছু দূরে দূরে কূপ আছে । অনেকগুলি কূপের জল খুবই সুস্বাদু । যে সমস্ত জায়গায় রাত্রি যাপন ও সৎসঙ্গাদি হয় সেগুলি সাধারনতঃ আমবাগান । গ্রামবাসীরা সর্বপ্রকারেই সহযোগিতা করেন । কোন কোন অংশে ঘন বালিমাটির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, মাঝে মাঝে গ্রামের ভেতর দিয়েও যেতে হয় । অনেকেই আহারাদির ও সৎসঙ্গাদির ব্যবস্থা করেন । পথের ধারে চিড়ে-গুড় বিতরণের ব্যবস্থা করেন ।

নির্দিষ্ট পথে ৬ ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা চলার পর বেলা ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে সকলেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যান । অনেকে গরুর গাড়ী করে খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য জিনিষপত্র বহন করেন । অনেকে তাঁবু ও মাইক প্রভৃতি নিয়ে যাত্রা করেন । সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্য্যন্ত এবং বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত্রী ৯টা পর্য্যন্ত । প্রত্যেক রাত্রি যাপনের স্থানেতেই সৎসঙ্গ ও ধর্মলোচনা প্রভৃতি হয় ।

যে সময়টিতে এই পরিক্রমা আরম্ভ হয় সেই সময় শীত থাকে,কাজেই কম্বল প্রভৃতির প্রয়োজন হয় । এখানে প্রত্যেক পরিক্রমা কালের ১৫ দিনে অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়, সেজন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া সঙ্গত ।

বর্তমান সময়ে নতূন নতূন রাস্তা তৈরী হওয়ার জন্য পরিক্রমার পথ ঐরাস্তা দিয়েই হয়েছে ।এই পরিক্রমাকালে গোমতী নদী দুবার পার হতে হয় । এই পরিক্রমা নৈমিষারণ্য থেকে শুরু হয় এবং ৯ দিন পরে নৈমিষারণ্যতে পুনঃরাগমন হয় ও রাত্রি যাপন হয় । পরদিন ভোর থেকে আবার যাত্রা শুরু হয় । এবার পরিক্রমা অন্যদিকে অর্থাৎ মিশরীক্ষের বা মিশ্রিখের দিকে । গোমতী নদীর ধার দিয়ে কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হয় । তারপর মাঠের ভিতর দিয়ে গ্রামের পাশে প্রাচীন তীর্থস্থানগুলি দেখতে দেখতে সন্ধ্যার কিছু আগে মিশরীক্ষ বা মিশ্রিখ নামক স্থানে মিলিত হতে হয় । ওখানে দশমী থেকে দোলপূর্নিমা পর্যন্ত মেলা বসে ।

পরিক্রমা পথটি পূর্ব - দক্ষিণে শুরু হয়ছে । নৈমিষারণ্য থেকে করৌনা, হঁরেয়া ও হত্যাহরন দক্ষিণপূর্বমুখী । হত্যাহরন থেকে নগ-ওয়া পশ্চিমমুখী । নগওয়া থেকে উমরী,সাখিন,দেব-গওয়া পর্যন্ত উত্তরমুখী । দেব-গওয়া থেকে মড়ে-রূওয়া পূর্বমুখী । মড়ে-রূওয়া থেকে জরি-গওয়া দক্ষিণমুখী । এই জরিগওয়া থেকে নৈমিষারণ্য পশ্চিমমুখী । এইভাবে একটি বৃত্তারকারে পরিক্রমাপথটি ভ্রমন করা হয় । নৈমিষারণ্য থেকে কিছু উত্তরে চিত্রকূট এবং চিত্রকূটের পূর্বে মিশ্রিখ – বালামৌ-সীতাপুর রেল-লাইনে একটি স্টেশন ।

❋ নিম্নলিখিত স্থানগুলি পরিক্রমার পথে বিশ্রামস্থল এবং রাত্রিযাপন, সৎ-সঙ্গাদি, ধর্মালোচনা পাঠ ও প্রবচনাদির স্থান ❋

১) করৌনা, ২) হঁরেয়া, ৩) নগওয়া, ৪) উমরী (গিরিধরপুর), ৫) সাখিন (গোপালপুর), ৬)দেব-গওয়া, ৭)মড়ে-রুওয়া, ৮) জরি-গওয়া, ৯)নৈমিষারণ্য, ১০) গোমতী নদীর ধারে রামেশ্বর-কোলহূয়া, জগন্নাথ, বদ্রীনারায়ন(বৈঠরী), চিত্রকূট, মিশরীক্ষ বা মিশ্রিখ ।

১)করৌনা -(প্রতিপদ তিথিতে) প্রথম দিনের বিশ্রামস্থল । এই গ্রামটি বর্ধিষ্ণু ও ধর্মপরায়নশীল । এখানে পৌঁছোবার আগে ঔরঙ্গাবাদ নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পড়ে । একে দ্বারিকাক্ষেত্র বলা হয়, কারণ দ্বারকাধীশ ভগবানের বিশাল মন্দির আছে । কিছু ভাগ্যপ্রসন্ন সাধু-যোগী ভগবান দ্বারকাধীশের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন ।

২)হঁরেয়া -(দ্বিতীয়া) করৌনা থেকে এখানকার উদ্দেশ্যে প্রায় ভোর ৪ টায় রওনা (অধিকাংশই) হতে হয় । এই স্থানটি গোমতী নদীর ওপারে অবস্থিত । পারাপারের জন্য ৪-৫টি নৌকার ব্যবস্থা আছে,ভাড়া ১০পয়সা । অধিকাংশ যাত্রী প্রায় ৫০০ গজ

৩৮৪ ক্রোশ নৈমিষারণ্য পরিক্রমা -বামদিক থেকে আরম্ভ।৩২
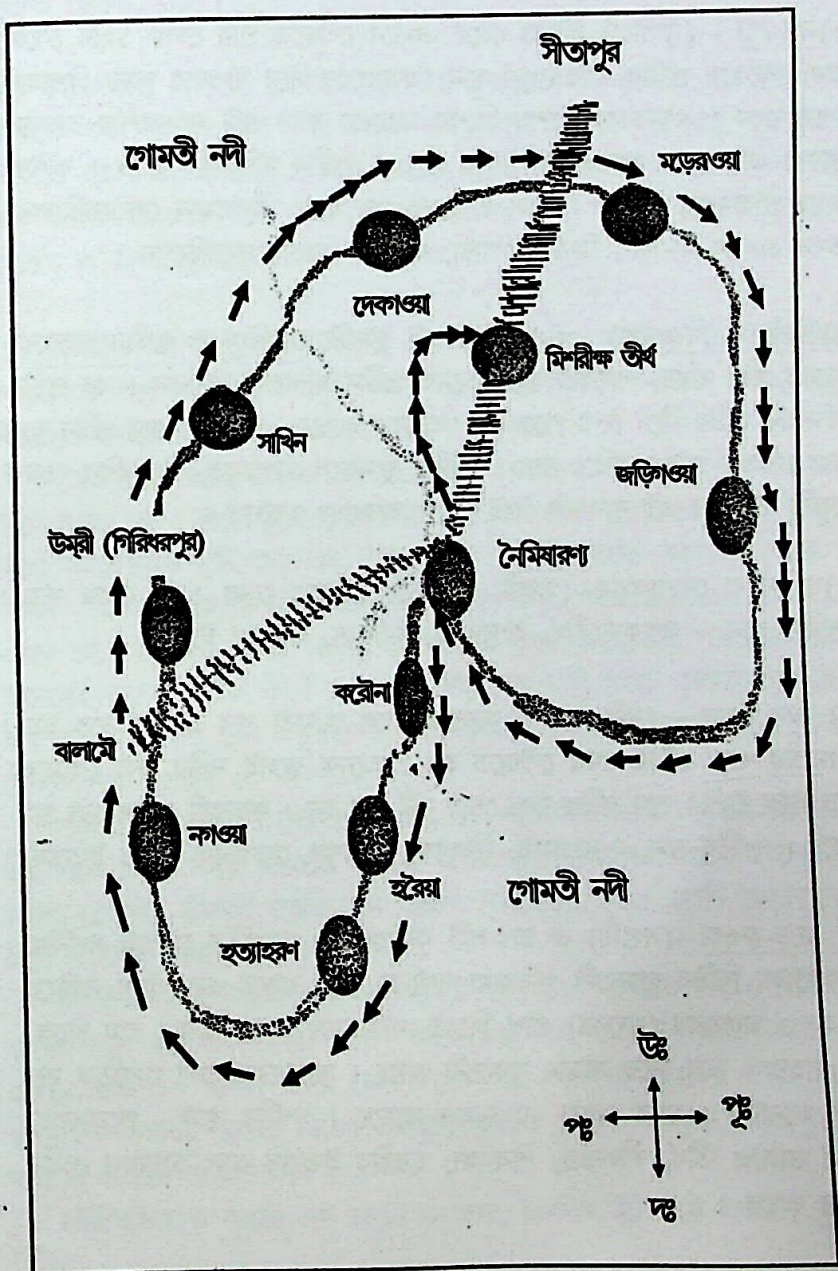
দূরে গোমতীর অল্প জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যান । অনেক প্রাচীন মন্দির আছে, কিন্তু শিবের প্রাচীন মন্দিরটি দর্শনীয় ।

৩)নগওয়া -- (তৃতীয়া) হরৈয়া থেকে এখানে পৌঁছতে প্রায় বেলা ১২টা বেজে যায়। অনেকে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ন স্থান 'হত্যাহরণ'দিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্রামাদি সেড়ে নেন । এখানকার বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য হ'ল এটি নাগবংশীয় রাজাদের স্থান । এই স্থানে অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ন স্তূপ ও প্রাচীন মন্দিরাদি আছে । কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সীতার পাতাল প্রবেশের পর যখন তীর্থভ্রমনে বেড়িয়েছিলেন তখন এখানে নানারূপ ক্রিয়া, তপস্যা, ধ্যান ও যজ্ঞাদি করেছিলেন ।

৪)উমরী বা গিরধরপুর - (চতুর্থী) এই স্থানটিতে বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন প্রভাবের অনেক চিহ্ন আছে, পার্শ্ববর্তী স্থানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান । বহু প্রাচীন মন্দিরাদি মাটির নীচে চাঁপা পড়ে স্তূপে পরিনত হয়েছে । এখানে এলে প্রাচীন যুগের কথা সততই স্মরণ করিয়ে দেয় । দর্শনীয় স্থানরূপে সাধয়ামৃত, নিরমেশিন, তম্বরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । এই স্থানগুলি সবই হরদৈ অঞ্চলের অর্ন্তগত ।

৫)সাখিন বা গোপালপুর -(পঞ্চমী) এখানে পৌঁছতে বেলা ১১টা বেজে যায় । দর্শনীয় স্থান -- দশকণ্যাতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, সূর্য্যকুন্ড, জগন্নাথ ইত্যাদি ।

৬) দেব-গওয়া - (ষষ্ঠী) এখানে আসতে গেলে গোমতী পার হয়ে আসতে হয় । গোমতীর ধারে ৮টার সময় পৌঁছতে হয় । অনেক স্থলেই নদীর জল কোমরের নীচে থাকে, বেশীর ভাগ যাত্রীরা জল ভেঙ্গে নদী পার হন । কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রাম আছে । দর্শনীয় স্থান -- নাগালয়, নীলগঙ্গা, ঋষিশৃঙ্গ, দ্রোণাচার্য্য পর্বত ইত্যাদি ।

৭) মড়ে-রুওয়া -(সপ্তমী) এ অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনীয় । সকালবেলা বিভিন্ন গ্রামবাসী পরিক্রমা দর্শনের জন্য রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন । নাহারের (খালের) পাশ দিয়েই পরিক্রমার রাস্তা, রাস্তার বাম দিকে এই নাহার । ডান দিকে সাজান বৃক্ষশ্রেনী আছে । সূর্যোদয়ের সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম । মাঝে মাঝে বহু গ্রামও রয়েছে । দর্শনীয় স্থান - প্রমোদবন, চন্দন তালাও তীর্থ, শীলভদ্র, শিবগঙ্গা, হয়গ্রীব ইত্যাদি এবং চন্দ্রাবল দেবীর মন্দির আছে ।

৮) জরি-গওয়া -(অষ্টমী) এই স্থানটি বেশী নির্জন এবং গ্রামের বাইরে, একটু দূরে অবস্থিত । দর্শনীয় স্থান - রূপকুন্ড, কুর্যাবর্ত্ত, কলপকেশ্বর ও বিশাল মহুয়া বৃক্ষের প্রাধান্য আছে ।

৯) নৈমিষারণ্য -(নবমী) পরিক্রমার পর পুনঃরায় এই ভূমিতে প্রত্যাবর্তন । এখানে লক্ষ্য করলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, আরোহ করে অবোরহে পুনঃরায় আসতে হয় । ঐটিই প্রধান প্রসাদ । সকলের সাথে একাত্মভাব, এক প্রেমময়ভাবই এই যাত্রায় সহায়তা করে । এখানে রাত্রিযাপনের পর, পরদিন সকালে পুনঃরায় মিশ্রিখ্ বা মিশরীক্ষ তীর্থের দিকে পরিক্রমা ।

১০)মিশরীক্ষ বা মিশ্রিখ্তীর্থ-(দশমী) নৈমিষারণ্য থেকে মিশরীক্ষ বা মিশ্রিখ্তীর্থ পরিক্রমার পথে বহু পূর্বে চিত্রকুট নামক স্থানে একরাত্রি যাপন করা হোত,কিন্তু বর্তমানে দশমীর দিনই মিশ্রিক্ষ তীর্থে চলে যাওয়া হয় ।

নৈমিষারণ্যে রাত্রি যাপনের পর ভোরবেলায় আবার যাত্রা । গোমতী নদীর ধার দিয়ে যেতে হয় । মাঝে মাঝে ছোট ছোট নালা অতিক্রম করে যেতে হয় । পথ-মধ্যে সমাধিস্থানও দৃষ্টিগোচর হয় । পূন্যাথী ও দর্শনাথীর সংখ্যা কমে যায়, তার কারণ - এখান থেকে মিশরীক্ষ তীর্থ ১২ মাইল কিন্তু, পাকা সড়ক ৬ মাইল । এখান থেকে মিশরীক্ষ যাবার বাসের বা মোটরের রাস্তা আছে,তাই পরিশ্রান্ত দেহে অনেকেই বাসে মিশরীক্ষ তীর্থে চলে যায়, সেই হেতু যাত্রী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হয় । দর্শনীয় স্থান –কুরুক্ষেত্র, বৈদ্যনাথধাম, গোবর্দ্ধন, কামবন, লালবন, দেবদেবেশ্বর ইত্যাদি ।

সাধুসন্যাসীগণ এখনও সেই প্রাচীন পথ ধরে পরিক্রমার নিয়ম অনুযায়ী চলেন । এই পথে চলার সময় রামেশ্বর মন্দির, জগন্নাথদেবের মন্দির, বদ্রীনারায়নের - মন্দির (বৈঠরী), চিত্রকুট প্রভৃতি স্থান আজও দৃষ্টিগোচর হয় । একটি মেলাস্থানে এসে পরিক্রমা সমাপ্ত হয় ।

মিশরীক্ষ রেলস্টেশন থেকে এই স্থানটি প্রায় ১০ মিনিটের পথ । বিভিন্ন স্থানের সাথে বড় বড় রাস্তার সংযোগ আছে এবং বাস বা মোটর সার্ভিস আছে । এখানে প্রায় এক মাইল ব্যাপী মেলা বসে । ৫ - ৬ লক্ষ লোকের ভীড় হয় । এখানকার দর্শনীয় স্থানের ভিতর মহামুনি দধীচির মন্দির ও কুন্ড, সীতাকুন্ড, অন্যান্য আশ্রম ও মন্দিরাদি ।

দধীচিমন্দির ও কুন্ডটি এক বিরাট জলাশয়, চারদিক ইট দিয়ে বাঁধান । কুন্ডের

ওপর মন্দিরাদি শোভা পাচ্ছে। পাশেই সীতা কুন্ড। কথিত আছে - এই স্থানটিতে সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। এই মেলার পাশে জলসেচের জন্য স্রোতস্বিনী ছোট খাল আছে।

এই মিশরীক্ষ তীর্থস্থানটি এ অঞ্চলের প্রধান শহর ও ব্যবসাকেন্দ্র। তাছাড়া এ অঞ্চলের সরকারী অফিসাদি এখানেই অবস্থিত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এখনও পরিক্রমার বিধি বিশেষ বিশেষ দিনে বা বিশেষ বিশেষ তিথিতে বলবৎ আছে। নর্মদা পরিক্রমা, নৈমিষারণ্য পরিক্রমা, বৃন্দাবন পরিক্রমা, গিন্নার(অম্বিকাদেবী) পরিক্রমা, হিমালয়ের উপর চার-ধাম পরিক্রমা ভারতের প্রাচীন পরিক্রমার পদ্ধতি আজও বহন করে চলেছে। নর্মদা নদী ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে তিন বৎসরে প্রায় ১৮০০ মাইল পরিক্রমার বিধি। নৈমিষারণ্য ৮৪ ক্রোশ, বৃন্দাবন ৮৪ ক্রোশ। এইটি ছাড়া অন্যান্য স্থানে প্রায়শঃই ৫ ক্রোশ পরিক্রমাদি হয়।

এই পরিক্রমার বহু উপকারিতা আছে বলে প্রাচীন সাধুগণ এর বিধান দিয়েছিলেন এবং নিজেরাও এইরূপ পরিক্রমা করতেন। নৈমিষারণ্য তীর্থ পরিক্রমায় জ্ঞান,ভক্তি বৃদ্ধি পায়। আচার ব্যবহার ক্রিয়া শুদ্ধ হয়, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি লাভ করে, পরস্পরের সাথে মিলন স্থাপিত হয়, পরস্পর আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ঘনিষ্ঠভাব প্রেমের ভাব গড়ে ওঠে। সামাজিক নৈতিক কর্মানুষ্ঠানাদির সংযোগসাধন হয়, আনন্দের বিস্তারলাভ হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয়, এমন কি প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিকাশ হয়। সব পরিক্রমাতেই অবশ্য এই ফল হয়।

১) সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যেই পরিপূর্ন জীবনের প্রথম সার্থকতা।

২) ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পর যে কোন কর্মই সহজ ও সরল হয়ে লক্ষ্য পথে নিয়ে যায়।

৩) মহাকৃপার একমাত্র পথ দেখিয়ে দেন শ্রীগুরু,নিজের চেষ্টা ও শ্রীগুরুর প্রসাদেই অমৃত লাভ হয়। গুরু ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য হয় না, হলে তা ক্ষণস্থায়ী হয়।

৪) দর্শনই সবকিছু নয় - তথায় গমনই জীবনের লক্ষ্য। আগে ঔপদেশিক, পরে অন্যান্য পরমবস্তু।

৯৩ ফাল্গুণ মাসে নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য। ৩২

গর্গ-সংহিতাতে আছে, ফাল্গুণ মাসে এই স্থানের মাহাত্ম্য অধিক । তাই, ফাল্গুণ মাসেই নৈমিষারণ্যের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা প্রতি বৎসরেই হয়ে থাকে ।

" চন্দ্রগ্রহে তু কাশ্যয়াং ফাল্গুণে তথা ।
একাদশাং শুকরে চ কার্ত্তিক্যা গুণমক্তিদে ।। "

স্কন্দ-পুরাণেতে(বৈষ্ণব খন্ডতে) আছে যে, পাঁচটি পবিত্র ধাঁরা নৈমিষারণ্যের সঙ্গে মাটির নীচ দিয়ে সংযুক্ত এখনও আছে –প্রভাষতীর্থ, পুষ্করতীর্থ, গয়াতীর্থ, নৈমিষারণ্য ও বদ্রীনারায়ণ ।

শিব-পুরাণেতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে -- বৃহস্পতি এবং সূর্য্য, মেষ-রাশির সঙ্গে যুক্ত হলে, নৈমিষারণ্যে ও বদ্রীনারায়ণে -- বৃহস্পতিবার এবং রবিবার স্নান করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । এই তিথি প্রত্যেক ১২ বৎসর অন্তর পড়ে, সেজন্য কুম্ভমেলা প্রতি ১২ বৎসর অন্তর হয় ।

"নৈমিষে বদরে স্নায়াণ্মেষ গে চ গুরু রবৌ ।
ব্রহ্মলোক প্রদং বিদ্যাত্তর্তঃ পূজাদিকং তথা ।।"

নৈমিষারণ্যতে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমায় দুবার পরিক্রমা করেছি । গ্রামবাসীদের ভক্তি ও সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি । ধর্মের প্রতি এতো অনুরাগ অন্যত্র আছে কিনা আমার তা জানা নেই । কলকাতাতে নৈমিষারণ্য সম্বন্ধে বইয়ের অনেক খোঁজ করেছি কিন্তু পাইনি ।

৪৩ পুরাণগুলির নাম ও বিবরণ। ৩২

পুরাণভূমি বলতে নৈমিষারণ্যকেই বোঝায় । এখানে অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ লেখা হয়েছিল - তা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১২/৭/২৩ - ২৪ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে ।

❋ অষ্টাদশ - মহাপুরাণ ❋

১) ব্রহ্ম পুরাণ ।
২) বিষ্ণু পুরাণ ।
৩) শিব পুরান ।
৪) পদ্ম পুরাণ ।
৫) লিঙ্গ পুরাণ ।
৬) গরুড় পুরাণ ।
৭) নারদ পুরাণ ।
৮) ভাগবত পুরাণ ।
৯) অগ্নি পুরাণ ।
১০) স্কন্দ পুরাণ ।
১১) ভবিষ্য পুরাণ ।
১২) ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ ।
১৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।
১৪) বরাহ পুরাণ ।
১৫) বামন পুরাণ ।
১৬) মাৎস পুরাণ ।
১৭) কুর্ম্ম পুরাণ ।
১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

❋ অষ্টাদশ - উপ-পুরাণ ❋

১) আদি পুরাণ ।
২) নরসিংহ পুরাণ ।
৩) স্কন্দ পুরাণ ।
৪) শিবধর্ম পুরাণ ।
৫) দুর্বাসা পুরাণ ।
৬) নারদোক্ত পুরাণ ।
৭) কপিল পুরাণ ।
৮) বামন পুরাণ ।
৯) ঔশনস পুরাণ ।
১০) ব্রহ্মাড় পুরাণ ।
১১) বরুন পুরাণ ।
১২) কালিকা পুরাণ ।
১৩) মহেশ্বর পুরাণ ।
১৪) সাম্ব পুরাণ ।
১৫) সৌর পুরাণ ।
১৬) পরাশর পুরাণ ।
১৭) মারীচ পুরাণ ।
১৮)ভাস্কর পুরাণ ।

তাছাড়াও অষ্টাদশ সহ-উপপুরাণ বৃহৎ বিবেক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । সমস্ত পুরাণগুলি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর নৈমিষারণ্য মন্দিরে সংরক্ষিত আছে এবং নিত্যপূজা হয় ।

❋ অষ্টাদশ সহ-উপ-পুরাণ। ❋

১) সনৎ কুমার পুরাণ ।
২) বহন্নারদীয় পুরাণ ।
৩) আদিত্য পুরাণ ।
৪) মানব পুরাণ ।
৫) নান্দিকেশ্বর পুরাণ ।
৬) কৌর্ম্ম পুরাণ ।
৭) ভাগবত পুরাণ ।
৮) বশিষ্ঠ পুরাণ ।
৯) ভার্গব পুরাণ ।
১০) কল্কি পুরাণ।
১১) মদগল পুরাণ ।
১২) দেবী পুরাণ ।
১৩) মহাভাগবত পুরাণ ।
১৪) বৃহদর্ম্ম পুরাণ ।
১৫) পরানন্দ পুরাণ ।
১৬) পশুপতি পুরাণ ।
১৭) বহ্নি পুরাণ ।
১৮) হরিবংশ পুরাণ ।

পুরাণশাস্ত্রগুলি সকল শ্রেণীর উন্নত মানুষের এক মহাসম্পদ এবং এতে সর্ব-বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে। বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্নভাবে, নানা বিষয়ে লিখিত হলেও, একটি অপরটিকে সাহায্য করেছে এবং সংযোগ রক্ষা করে বৈশিষ্ট্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত,তাই সমুদয় পুরাণের এত ঐতিহ্য ।

১) <u>ব্রহ্মপুরাণ</u> -পুরাণ সমূহের আদি বলিয়া বর্নিত হইয়াছে — অনেকে, এই পুরাণকে সৌর পুরাণ বলে অভিহিত করেছেন । সূর্য্য উপাসকগণ এই পুরাণকে অধিক প্রাধান্য দেয় । এর দৃষ্টি ভাগ আছে পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ । পূর্বভাগে — দেবতা, অসুর, দক্ষ, প্রজাপতির উৎপত্তি, সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, এছাড়া দ্বীপ,সমুদ্র, স্বর্গ এবং পাতালের বর্ননা ও নরকের বিবরণ । পার্বতীর জন্ম ও বিবাহ সম্বন্ধে লেখা আছে । উত্তরভাগে - তীর্থযাত্রার বিধি,পুরুষোত্তম বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন,যমলোক সম্বন্ধীয়, শ্রাদ্ধ, বর্নাশ্রম বিধি, বিষ্ণুধর্ম, যুগবিবরণ, প্রলয়বর্ণন, যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি ।

২) <u>বিষ্ণুপুরাণ</u> - দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে- আদিসৃষ্টি, দেবতাদের উদ্ভব, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান, দ্বীপ ও বর্ষ নিরূপন, পাতাল ও নরক বর্ননা,ভারতের উপাখ্যান, মন্বন্তর কথন, বেদব্যাসের উদ্ভব, বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা, শ্রাদ্ধবিধান, সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, কৃষ্ণবতার কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোর ও যৌবন-লীলা, মহামুনি অষ্টবক্রমুনির উপাখ্যান ব্রহ্মজ্ঞান । দ্বিতীয়ভাগে - ধর্মকথা,ব্রত-নিয়মাদি, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি ।

৩)<u>বায়ুপুরাণ</u> -এটিরও দুটি ভাগ আছে - পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ। পূর্বভাগে - স্বর্গাদির লক্ষণ মন্বন্তর, গয়াসুর বিনাশ, মাসসমূহের মাহাত্ম্য, দানধর্ম, রাজধর্ম, ভূমি ও পাতাল, আকাশচারীদের দিক নির্ণয় এবং ব্রতাদির নিয়ম বলা আছে। উওরভাগে — নর্মদাতীর্থ বর্ণন, রেবাতীর্থ, সাগরসঙ্গমে বর্ণন, শিব-সংহিতা প্রভৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪)<u>পদ্মপুরাণ</u> -এই পুরাণটিকে দ্বিতীয় পুরাণ বলা হয়। এতে সর্বভুতাশ্রয় সম্বন্ধীয় উল্লেখ আছে। শ্লোকসংখ্যা ৫,৫০০, পাঁচটি খন্ড যথা — সৃষ্টিখন্ড, ভূমিখন্ড, স্বর্গ-খন্ড, পাতালখন্ড ও উত্তরখন্ড। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রচারই এই পুরাণের প্রধান কার্য্যাসৃষ্টির আদিক্রম, তারকাসুরের উপাখ্যান, গো-মাহাত্ম্য, বৃত্রাসুর বধ, নহুষ ও যযাতির কাহিনী, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থাদির মাহাত্ম্য বর্ণন, অগস্ত্যাদি-ঋষির আগমন, জগন্নাথের বিবরণ, কৃষ্ণের লীলাকথন শিবমাহাত্ম্য, জালন্ধরের কথা, গঙ্গাঁমাহাত্ম্য, একাদশী মাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তি, জম্বুদীপান্তর্গত তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য, ভাগবতের বৈশিষ্ট্য মৎস্যাদি অবতার ইত্যাদি।

৫)<u>লিঙ্গপুরাণ</u> - এর শ্লোকসংখ্যা ১১০০০। লিঙ্গপূজা,দধীচির উপাখ্যান, যুগধর্ম-নির্ণয়,শিবব্রত,প্রায়শ্চিত্ত,কাশীবর্ণন। বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, শিবের সহস্রনাম, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, বিনায়ক(গনেশ) উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যু উপাখ্যান, অম্বরীষ উপাখ্যান, শিবমাহাত্ম্য, সূর্যপূজাবিধি, দানপ্রকরণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

৬)<u>গরুড় পুরাণ</u> - শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিত হয়ে - গরুড়ের উৎপত্তি, বিষ্ণুর জগৎ সৃষ্টির কথা, গড়ুরকে বলেছেন। এতে দুটি খন্ড আছে - পূর্বখন্ড ও উওরখন্ড। পূর্বখন্ডে - বিষ্ণুর সহস্রনাম, পূজাবিধি, দীক্ষাদান, আয়ুর্বেদ এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধি। উত্তরখন্ডে - অন্তেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বিষয়, প্রেতত্ত্বের কারণ, মৃত্যুর পূর্বাপর বিষয় সম্বন্ধে আছে।

৭)<u>নারদ পুরাণ</u> - এই পুরাণটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ — সৃষ্টিতত্ত্ব, নানাবিধ ধর্মকথা, মোক্ষ লাভের উপায়, মন্ত্রশোধন, বেদাঙ্গ সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়তঃ — একাদশীব্রত, প্রয়াগ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য ইত্যাদির বিবরণ লেখা আছে।

৮)<u>ভাগবত পুরাণ</u> - এই পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বনে সম্পূর্ণ ধর্মতত্ত্বকে বর্ননা

করা হয়েছে। এটি নিত্যপূজা ও নিত্যপাঠ হয়ে থাকে। সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ ব্যয়বহুল এবং দুষ্প্রাপ্য হলেও যে গৃহে বা আশ্রমে থাকে - সেই স্থান ভগবৎকৃপা বা ভগবৎ-অনুগ্রহ বলা যায়।

যে কোন বর্ণের, সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং সকল মানুষের প্রকৃত বন্ধুরূপে এই গ্রন্থগুলি সমাদৃত হয়ে আসছে। জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞান হতে সহজ ও সরল উপায়ে বিশদ্‌ভাবে রস ও ভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে নিজস্ব পরিবেশন-শক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ এই গ্রন্থসকল। পুরাণশাস্ত্রে ব্যাসদেব এবং অন্যান্য মুনি-ঋষি গণের সাধনলব্ধ ও তপসিদ্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই ভূমিতে শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ীর পুরাণমন্দির ও পুরাণ পুরুষের মুর্ত্তিটি যেরূপ আছে, তেমনই তপোভূমির সু-সাহিত্য এবং বিশেষ সংগৃহীত সৎগ্রন্থাদি,স্মরণ-মননের দিব্য উপায় এবং উদ্দেশ্যে রক্ষিত আছে। তাছাড়াও প্রায় সকল প্রকার ধর্মগ্রন্থই এখানে পাঠ করা হয়।

নৈমিষারণ্যে এসেছিলেন এমন মুনিঋষিগণ।

শৃষ্যশৃঙ্গ -মহর্ষি শৃষ্যশৃঙ্গের দ্বারা নৈমিষারণ্যতে রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল, নৈমিষারণ্য সাধনার সিদ্ধভূমি সেই কারণে এখানে কোনকিছুই নিস্ফল হয় না। চক্রতীর্থের পূর্বতীরে যে মূর্ত্তিটী আছে তাহাই শৃঙ্গী ঋষির প্রতীক।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানেতে কামাখ্যা দেবীর বরদান স্বরূপ রাজা দশরথের ৪ পুত্র হয়েছিল বলে জানা যায়।

মহর্ষি বাল্মিকী -প্রাচীনকাল হতে কাব্য প্রণেতারূপে একমাত্র বাল্মিকীর নামই পাওয়া যায়। মানব কল্যাণের জন্য এক মৃত্যুঞ্জয়ী কাব্য রচনা করেছিলেন, তার নাম রেখেছিলেন রামায়ণ, উহা রাম সম্বন্ধীয় হলেও এটি ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধীয় অমূল্য কাব্যগ্রন্থ। ইহার মহিমা পরিচয়ে সারা সংসার সুপরিচিত এবং সারা বিশ্বের নিকট চিরস্মরণীয়।

মহর্ষি বাল্মিকী লব-কুশকে সম্পূর্ণ রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়েছিলেন। যখন ভগবান রামচন্দ্র নৈমিষারণ্যতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ছিলেন, সেই সময় মহর্ষি বাল্মিকী লব-কুশকে নিয়ে যজ্ঞতে উপস্থিত হন এবং লব-কুশ গোমতী নদীর তীরে দশাশ্বমেধ ঘাটেতে সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঠ করে রামচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। এমনকি কৌতুহলবশতঃ

এখানে পুনরায় সীতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, তখন সীতা মাতা ধরিত্রীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, "যদি অমি ভগবান রাম ছাড়া কারও প্রতি কোনপ্রকার মনের চিন্তা করে থাকি, তবে হে ধরিত্রীমাতা আমাকে আপনার কোলে স্থান দিন।" এই প্রকারে সীতা মাতা বিনা দ্বিধায় ও আনন্দে, নৈমিষারণ্যতেই পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

সেই কারণেই স্পষ্ট বিবেচিত হয় যে মহর্ষি বাল্মিকীর সঙ্গে নৈমিষারণ্যের অটুট সম্বন্ধ ছিল উপরন্তু, এই মহর্ষির মহান আত্মা ছিল,উনি পরব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করার ফলে, তাঁর দৃষ্টি সামান্য না হয়ে দিব্য দৃষ্টি ছিল। তাঁর লিখিত কাব্যগ্রন্থ "রামায়ণ "আজও সর্বভাবে,সর্বদেশে সমাদৃত বা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছে।

<u>বেদব্যাস</u> -১ লক্ষ শ্লোকের দ্বারা মহাভারত রচয়িতারূপে নামটি হয়নি। বেদের শাখাগুলির ব্যাস অর্থাৎ বিস্তার ও বেদের বিভাজনের জন্যই তার নাম বেদব্যাস হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় পরাশর মুনির ঔরস থেকে উৎপন্ন হওয়াতে -"পরাশর" নামেও খ্যাত ছিলেন। বেদব্যাসের গায়ের রং কালো ছিল, এবং একটি দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে কোন কোন স্থানে "কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস" নামেও পরিচিত ছিলেন।

কর্মপুরাণ অনুসারে দ্বাপর যুগেই বেদব্যাসের জন্ম হয়। তাঁর পাঁচজন প্রধান শিষ্য ছিল ১) বৈশ্যাম্পায়ণ,২) পৈলী,৩) সুমন্ত,৪) জৈমিনী ,ও ৫) লোমহর্ষণ সূত। সমস্ত বেদের বিভাজন এবং পুরাণ সমূহের পথ প্রদর্শক ছিলেন। ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকে বর লাভ করে মহাভারত, পুরাণাদি, উত্তরমীমাংসা(বেদান্ত) রচনা করেই কালজয়ী হয়ে আছেন।

বেদব্যাস তাঁর পাঁচ শিষ্যকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও তাদের আপন আপন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

১) পৈলীকে ঋক্‌বেদের পাঠক হিসাবে,২) বৈশ্যাম্পায়ণকে যজুঃর্বেদের প্রবক্তারূপে, ৩) জৈমিনীকে সামবেদের পাঠক এবং ৪) সুমন্তকে অথর্ব বেদের পাঠকরূপে শিক্ষাদান করেছিলেন ও ৫) সূতগোস্বামীকে ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্রতে বিধিমত শিক্ষা প্রদান করে, ইহাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন।

কর্মপুরাণ অনুসারে যজুঃর্বেদ একই ছিল,পরবর্ত্তীতে উহা হ'তে চার হোত্র হয়। যজুঃ দ্বারাই অধ্বর্য্যূ, ঋক্ থেকে অগ্নিহোত্র(হোতা), সাম থেকে উদ্গাতা এবং অথর্ব-মন্ত্র দ্বারা "ব্রহ্মার"কল্পনা করা হয়। তারপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস ঋক্ দিগকে পৃথক করে ঋক্‌বেদের সৃষ্টি করেন। যজুঃ মন্ত্র থেকে যজুঃর্বেদ এবং সাম-মন্ত্র থেকে সামবেদ প্রস্তুত করেন।

ভগবান ব্যাসই আঠারো ভাগে পুরাণাদি রচনা করেন ।

"ভেদৈরষ্টা দশৈব্যাসঃ পুরাণং কৃতবান্ প্রভুঃ"

এই পরাশর পুত্র মহামুনি ব্যাস ওঁকার স্বরূপ অব্যয় বেদ এবং অজ্ঞাত তত্ত্বকে জ্ঞাত করেছিলেন । মহামুনি বেদব্যাসের কথা বিষ্ণুর ২৪ অবতারের অন্তর্গত পাওয়া যায় । লেখার তাৎপর্য্য বা মূল কথা এই যে,বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতারই ছিলেন । কর্মপুরাণের নীচের দিকে যে শ্লোক আছে তা স্পষ্টতই লেখা আছে —

১) "কৃষ্ণদ্বৈপায়ণো ব্যাসো বিষ্ণুনারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অপান্তরতমা পূর্ব স্বেচ্ছয়া হ্যভবদ্ররিঃ ।।"

২)"দ্বাপরে -দ্বাপরে বিষ্ণু ব্যাসরূপী মহামুনি ।
বেদমেকং স বহুধা কুরূতে জগতো হিতঃ ।।"

প্রত্যেক যুগেতে বেদব্যাস ছিলেন । কেবল একই ব্যাস নয়, ইহারা বিভিন্ন যুগেতে বেদের(জ্ঞানের) বিস্তার করেন । শ্রী কালীপদ তর্কাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেতে লিখেছিলেন — ১ম-দ্বাপরেতে স্বায়ম্ভুব মনুকে ব্যাস বলা হয় । উনি ব্রহ্মার নির্দেশক্রমে অনেক প্রকার বেদের বিভাজন করেন । ২য়-দ্বাপরে প্রজাপতি বেদব্যাস হন । তৃতীয়-শুক্রাচার্য্য, চতুর্থতে-বৃহস্পতি ব্যাস হন । ৫মেতে-সবিতা, ৬ষ্ঠতে-মৃত্যু, ৭মতে-ইন্দ্র, ৮এতে-বশিষ্ঠকে বলা হয়, ৯ম দ্বাপরেতে - সারস্বত, ১০মেতে-ত্রিধামা, ১১রতে-ত্রিবিষং,১২রতে-শততেজা, ১৩এতে-ধর্ম, এবং ১৪এতে-তরক্ষু, ১৫এতে-আরুনি, ১৬তে-ধনঞ্জয়, ১৭তে-কৃতধ্বজ,১৮তে-ঋতজ্জয়, ১৯এতে-ভরদ্বাজ, ২০এতে-গৌতম, ২১ঐতে-বাচশ্রবা, ২২এতে-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ ব্যাস হন, ২৩এতে-তৃণবিন্দু, ২৪এতে-বাল্মিকী, ২৫এতে-শক্তি, ২৬এতে-পরাশরকে ব্যাস বলা হয়, ২৭এতে-মহামুনি জাতুকর্ণ ব্যাস হন এবং ২৮তম দ্বাপরযুগে মহামুনি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস বলে পরিচিত ছিলেন । ইহারা সবাই বেদ এবং পুরাণের পথ প্রদর্শক ।

এখনও দেখা যায়, গোমতী নদীর উত্তর তীরে (নৈমিষারণ্যতে) ব্যাসগদ্দী স্থানটি আছে । ইহার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর তপস্যাস্থল । মহর্ষি ব্যাস বদরীবনে (বদ্রীনাথ-ধাম থেকে ৩ কি.মি. দূরে) আশ্রম বানিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি বাদরায়ণ নামেও পরিচিত ।

পৌরাণিকোত্তম,লোমহর্ষণ সূত- সূত, ব্যাসের শিষ্যদের ভিতর পুরাণ কথা ও ইতিহাস সম্বন্ধে একজন বিশেষ বক্তা। এই সূত গোস্বামী যখন পুরাণাদি সম্বন্ধে প্রবচন করতেন,তাঁর মুখ দিয়ে অমৃত বর্ষণ হতো, যা পান করে মুনি-ঋষিগণ পরমসূখ এবং শান্তি লাভ করতেন। এই সূত পুরাণাদির প্রাতিভাসিক সূর্য্য ছিলেন, যিনি পুরাণজ্ঞানরূপ অমূল্যনিধি প্রকাশিত করতে পারতেন। সূত ৮৮ হাজার মুনিঋষিদের(শৌনিকাদি) জ্ঞান পিপাসা শান্ত করার প্রতিভাবান, ধর্মজ্ঞাতা, ধর্ম-উপদেষ্টারূপে নৈমিষারণ্যকে অলংকৃত করে রাখতেন। সূতের অর্থ মহাকবি কালিদাস,সারথী নামে অভিহিত করেন। মনুস্মৃতিকার মনু, – ব্রাহ্মণীর ক্ষত্রিয় থেকে উৎপন্ন পুত্রকে সূত নামে আখ্যা দিয়েছেন।

এই মনুস্মৃতিতে সূতের কর্ম মুখ্যরূপে রথের সারথীর কাজ করা বলে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরাণের মাধ্যমে জানা যায় যে, সূতের প্রবচণ শুনে মুগ্ধ হয়ে, বেণুপুত্র পৃথু সূতকে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। কোথাও কোথাও সূতকে ক্ষেত্রীপজীবিও বলা হয়েছে। পুরাণজ্ঞ সূত বেদব্যাসের নিকট হ'তে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তা জনহিতার্থে বিতরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। যদিও বর্ণসংকর কারণবশতঃ তাঁর বেদেতে অধিকার ছিল না,তথাপি মহামতি ধর্ম-বিশারদ, ধার্মিক বিচার এবং পবিত্রতার জন্য তাঁকে মহান বানিয়েছিল, তাঁর উপর বেদব্যাসের গুরু-প্রসাদ তীব্রভাবে বর্ষিত হয়েছিল তা বলা বাহুল্য।

সূতের নাম লোমহর্ষণ ছিল। এ বিষয়ে বলা যায়, – নিজের সুভাষিত প্রবচণের দ্বারা শ্রোতাদের লোম আনন্দে শিহরণ জাগতো, সেই কারণেই ইনি লোমহর্ষণ নামে খ্যাত। ইনি গুরু ব্যাসদেবের নিকট পবিত্রভাব নিয়ে পুরাণাদি পাঠ শিখে ছিলেন এবং নিজে স্মরণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের মাধ্যমে আয়ত্বে এনেছিলেন, উপরন্তু, বশিষ্ঠাদি গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও আজ্ঞা পেয়েই পুরাণাদির উপদেশ দান করতেন। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খন্ডে, কূর্মপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসহ অনেক পুরাণাদিতেই সূত গোস্বামীর নাম আছে। পুরাণাদির প্রবক্তা সূতজীর স্মৃতি চক্রতীর্থের পূর্বভাগে "সূতগদ্দী"নামে আজও বিদ্যমান।

৪তপোভূমি নৈমিষারণ্যতে এসেছিলেন যাঁরা সেই মুনিঋষিদের নাম এবং বিভিন্ন ব্রহ্মবাদী মুনি-ঋষিদের আগমন ৩২

মহারাজা দক্ষপ্রজাপতি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, রাজা পুরুরবা, মান্ধাতা, শ্রীরাম, পান্ডবগণ, সংকর্ষণ বলরাম, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, বাণাসুর, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি।

গর্গমুনি -গর্গ সংহিতার প্রণেতা, ইনি যোগভাস্কর শৌনক মুনিকে দর্শনের জন্য এখানে এসেছিলেন।

সন্দপণী -শ্রীকৃষ্ণের গুরুদেব ছিলেন, তাই গুরুর কষ্ট লাঘবের জন্য গোমতী নদীকে দ্বারকায় উদ্ভূত করেছিলেন।

পরশুরাম - মাতৃবধের পর তপস্যার জন্য এখানে এসে কঠোর তপস্যার পর ভগবান শংকরের বর প্রাপ্তির পর অনেকটাই শান্তিলাভ করেন।

ধর্মারণ্যমুনি -ইনি অত্রি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় হয়ে সংসার জীবন যাপনের পর সন্নাসী হন। বহুদিন গুহায় বাস করার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

বৈখানসব্রহ্মা -তুলসীদাসের রামচরিত মানসেতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, রাজা মনু ও শতরূপার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে এখানে এসেছিলেন।

মহাত্মা পদ্মনাভ -ইনি কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনাতে সিদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণের জন্য এখানে এসেছিলেন এবং ক্ষমাশীল, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে বিশদ্‌ভাবে উল্লেখ আছে।

মহর্ষি দধীচি -এই ভুমির সাথে মহর্ষি দধীচির নাম খুব গর্বের সাথেই সম্বন্ধিত। কথিত আছে যে, দধীচি বর্তমান বারাণসীর রাজা ছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে দধীচি ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল - গর্ভস্তিনী। দুজনেই তপস্যাতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকাতে তখনকার সময় কোন পিশাচ,দানব বা অসুর ঐ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারতো না,রীতিমত ভয়ই পেতো। কিছুদিন পর রুদ্র,আদিত্য,অশ্বিন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অসুরদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দধীচির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলে দধীচি ঋষি তাদের ভালভাবে সম্মানের সহিতই সেবা ও আহারাদির দ্বারা আপ্যায়িত করেন, তারপর সব দেবতাগণ ঋষিকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করে, তাদের যুদ্ধ অস্ত্রসমূহ ঐ আশ্রমে রেখে গেলেন এবং অস্ত্রগুলি সুরক্ষিত স্থানে রাখা হ'ল বলে বিবেচনা করলেন(দেবতারা),কারণ ঐ আশ্রমেতে কোন অসুরের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এভাবে হাজার বৎসর কেটে গেল, দেবতারা নিজেদের রাখা অস্ত্র বিষয়ে কোনরকম খোঁজখবর রাখেননি, অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবেননি এবং ভুলেই গেছেন। এমতাবস্থাতে দধীচি ঋষি - তাঁর স্ত্রী গর্ভস্তিনীকে বললেন যে "বহু বৎসর কেটে গেল, দেবতারা অস্ত্রগুলি নিয়েও গেল না বা নিয়ে যাবে বলে কোন সংবাদও তো দিল না।"-এরজন্য কি উপায় করতে পারি ? দধীচির স্ত্রী বললেন আমি এই অস্ত্রগুলি রাখার প্রথমে সন্মত হইনি, এখন এই অস্ত্রগুলি রাখারই বা প্রয়োজন কি ? আপনি যেরূপ ভাল মনে করেন তাহাই করুন। দধীচি ঋষি

এভাবে অস্ত্রগুলি পড়ে থাকলে অসুর, দৈত্য ও দানবগণ যাতে অনায়াসেই সেগুলি নিয়ে পলায়ন করতে না পারে সেজন্য মন্ত্রশক্তির মাধ্যমে অস্ত্রগুলিকে দেহের ভিতর পান করে ফেললেন, তাতে অস্ত্রগুলি রক্ষিত হ'ল।

তারপর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, হঠাৎ দেবতাগণ দধীচিঋষিকে বললেন যে, -আমাদের উপর পুণরায় অসুরদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে, আপনার কাছে রাখা অস্ত্রগুলির প্রয়োজন হয়েছে, ঐগুলি আমাদের দিয়ে দিন। দধীচি-ঋষি বললেন যে, - অসুরদের ভয়ে এবং আপনারা অস্ত্রগুলি নিয়ে যাচ্ছেন না, চুরি যাওয়ার ভয়ে সেগুলি বেঁটে জলের সাথে খেয়ে ফেলেছি, তাই ওগুলি আমার দেহের ভিতরেই আছে। দেবতাগণ বললেন যে, ঐ অস্ত্রগুলির অভাবে আমাদের যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না,এমনকি অসুরদের ভয়ে আমরা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল কোথাও থাকতে পারবো না। তখন দধীচিঋষি বললেন যে, ঐ অস্ত্রগুলি খেয়ে ফেলাতে অস্ত্রগুলির শক্তি আমার হাড়ের ভিতর আছে, সেজন্য হাড় কেঁটে দিলে, ঐ হাড় দিয়ে অস্ত্র বানালেই অসুরেরা বধ হবে। দধীচিঋষি আরও বললেন যে, — "পরোপকারের জন্যই এ শরীর তাই, এ শরীর পরোপকারে লাগলেই অতি উত্তম।"তারপর যোগস্থ হয়ে গাভীর দ্বারা চাটিয়ে অস্থি বের করে, দেবতাদের দেওয়া হলো, দেবতারা ঐ অস্থির দ্বারা বজ্র বানিয়ে বৃত্তাসুরকে বধ করলেন এবং স্বর্গরাজ্য উদ্ধার হ'ল।

<u>বকদালভ্য মুনি</u> - বামনপুরাণে এই বকদালভ্য মুনির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি নৈমিষারণ্যতেই বাস করতেন। একবার রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দক্ষিণালাভের জন্য গিয়ে খুবই অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন, এবং ঐ অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে অবকীর্ণ নামক তীর্থতে নিজের মাংস কেটে কেটে যজ্ঞতে আহুতি দিয়েছিলেন। বলা যায় যে ইনি দুর্বাশা মুনির মতোই ক্রোধী ছিলেন। এই মুনির আর্শমটি ছিল রায়বেরীলি জেলার অন্তর্গত "ডলমউ"নামক স্থানে।

<u>কাশ্যপ মুনি</u> - ইনি প্রজাপতি দক্ষের কণ্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কথিত আছে যে (পদ্মপুরাণে),কশ্যপমুনি একবার নৈমিষারণ্যে এলে, কোন এক ঋষি তাঁকে গঙ্গাকে নৈমিষারণ্যে আনয়ণের জন্য অনুরোধ করার পর, ইনি শংকরের বর পেয়ে নৈমিষারণ্যে গঙ্গাকে এনেছিলেন, তাই এখনও ঐ গঙ্গাকে কাশ্যপীগঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবতঃ ব্যাসগদ্দীর নীচে প্রবাহিত গঙ্গাকেই কাশ্যপীগঙ্গা বলা হয়।

<u>মহামুনি মার্কন্ডেয়</u> -দ্বাদশবর্ষ যজ্ঞ করার পর গঙ্গাকে অবতরণ করিয়েছিলেন ।

<u>নারদ</u> -ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি মহামুনি নারদ বার বার এই নৈমিষারণ্য তপোভূমিতে আসতেন । পদ্মপুরাণে মহামুনি নারদের কথা পাওয়া যায় । লিঙ্গপুরাণেতেও এই নৈমিষারণ্যে মহামুনি নারদের আগমনের কথা লিখিত আছে ।

<u>বশিষ্ঠ</u> - রাজা দশরথের কূলগুরু এই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ।স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে — তাহার আশ্রম ছিল "মোহেরকপুর ", নৈমিষারণ্য পরিক্রমার পথে নিশ্চয়ই আছে । এমনকি বিশ্বামিত্রের সহিত ঝগড়া এইখানে তপস্যার সময়েই হয়েছিল । মহাভারতে আছে যে,স্বর্গ থেকে যযাতি এই নৈমিষারণ্যতেই পতিত হয়েছিলেন, এমনকি ভগবান রামচন্দ্র হত্যাহরণ নামক স্থানে (পরিক্রমা পথে)হত্যা করার অপরাধে তপস্যা ও যজ্ঞাদি করেছিলেন, ঐ স্থানটি বর্ত্তমানেও দেখা যায় ।

<u>মহর্ষি শৌনিক মুনি</u> -নৈমিষারণ্যের তপস্বীদের মধ্যে মহর্ষি শৌনিক অগ্রগণ্য ছিলেন । পুরাণেতে মহর্ষি শৌনিকের দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞের উল্লেখ আজও পাওয়া যায় । মহাভারতের আদিপর্বে এবং ব্রহ্মপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে শৌনিকাদি ঋষির দ্বারা ১২ বৎসর যাবৎ যজ্ঞ করার ইতিহাস পাওয়া যায় । সূতগদ্দীর ঠিক নীচের জায়গাটিতে এই যজ্ঞের স্থানটি এখনও সুরক্ষিত আছে । অগ্নিপুরাণ, মৎস-পুরাণেতেও দীর্ঘ বৎসর যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায় । শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের আদিখন্ডে, নৈমিষারণ্যেতে - সহস্রবৎসর যজ্ঞ করার কথাও দেখা যায় ।

মহর্ষি শৌনিককে গৃহপতি বা কুলপতিরূপেও আখ্যায়িত করা হতো । হাজার হাজার বিদ্যাথীর বিদ্যাদান, থাকার ও ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন জন্যই তাঁকে গৃহপতি বা কুলপতি বলা হতো ।

এমনকি মহর্ষি শৌনিককে - গৃস্যমদ্-পুত্র শুনকের পুত্র শৌনিক বলা হয় । সুবিখ্যাত আচার্য্য আশ্বলায়নের গুরু বলেও ডাকা হতো । যজ্ঞের প্রভাবে অসুরদের আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষা করতেন, সেজন্য দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি শৌনিক ঋষিকে প্রসন্ন হয়ে বরদান করেছিলেন, — "ভৃগুকুলে তোমার শৌনিক-ভার্গব নামে জন্ম হবে ।" মহর্ষি শৌনিকের অনেক গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় । — ১)ঋগ্বেদপ্রতি শাস্ত্র, ২)ঋগ্বেদছন্দানুক্রমণী, ৩)ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণী, ৪) ঋগ্বেদ-সুক্তানুক্রমণী, ৫)শৌনিক স্মৃতি, ৬) চরণবুহ্য, তাছাড়াও বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থও আছে

শৌনিক ঋষি নামে অনেক শৌনিকের নাম পাওয়া যায়, ১) ব্যাকরণ শাস্ত্রকার শৌনিক, ২) শিক্ষাকার শৌনিক, ৩)তত্ত্বজ্ঞানী শৌনিক, ৪) পৌরানিক নৈমিষীয় শৌনিক, ৫) গৃৎস শৌনিক প্রভৃতি। মহর্ষি শৌনিককের শিষ্য - আশ্বলায়ন এবং আশ্বলায়নের শিষ্য কাত্যায়ন। কাত্যায়নের শিষ্য পতঞ্জলিকে শিক্ষাদান করে নিজের লেখা গ্রন্থগুলি - যজুর্বেদকল্পসূত্র, সামবেদ - উপগ্রন্থ ইত্যাদি শিষ্য পতঞ্জলিকে দান করেছিলেন। পতঞ্জলিমুনি অষ্টাঙ্গ যোগের(যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) প্রবর্ত্তক ছিলেন। গুরুপরম্পরারূপে এসেছিলেন - বেদব্যাস, লোমহর্ষণ সূত, মহর্ষি শৌনিক(নৈমিষীয়),আচার্য্য আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি মুনি। সাংখ্যযোগ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন কপিল মুনি, তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ২৪ তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়ে। ইহাই জ্ঞানযোগ। এই সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতরূপ পতঞ্জলি মুনির যোগদর্শনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কৌণ্ডিণ্য ঋষি-পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডতে এই ঋষির নাম পাওয়া যায়। এনার আশ্রম হস্তিমতী এবং সাভ্রমতীর সঙ্গমস্থলে ছিল। একবার বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ নদী দুইটির জল প্রবলাকার ধারণ করে, এমনকি ঐ কৌণ্ডিণ্য ঋষির আশ্রম জল-স্রোতে ভেসে যায়, তখন এই ঋষি নদী দুইটিকে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য অভিশাপ দেন এবং তিনি তপোবল প্রভাবে বিষ্ণুলোকে চলে যান।

তাঁর স্মৃতিরূপে নৈমিষারণ্যতে মনু-শতরূপার তপস্যাক্ষেত্রতে একটি ছোট শিলা আজও বর্তমান। কথিত আছে যে, সাভ্রমতী নদীকে কশ্যপমুনি পুনরায় নৈমিষারণ্যে নিয়ে এসেছিলেন,এখন ঐ নদীকেই নৈমিষারণ্যতে কশ্যপীগঙ্গা বলা হয়। নিকটেই কশ্যপমুনির তপস্যাস্থলটী ছোট স্তুপ আকারে দেখা যায়।

কৌণ্ডিল্য ঋষি -সাণ্ডিল্য মুনির শিষ্য ছিলেন। কৌশিক মুনির গুরুদেব এই কৌণ্ডিল্য ঋষি।

অণি-মাণ্ডব্য ঋষি-পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইনি খুবই ধর্মনিষ্ঠ,সত্যনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন। মহাভারতের আদি-পর্বতে এই মাণ্ডব্য-ঋষির ইতিহাস লিখিত আছে যে, ইনি নিরপরাধী হওয়া সত্ত্বেও শূল-দণ্ডতে এনার মৃত্যু হয়েছিল। তপস্বী হওয়ায় লিঙ্গদেহ(সূক্ষ্মদেহ) ধারণ করে, যমরাজের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে, -"আমি নিরপরাধী হয়েও কেন, শূলেতে

মৃত্যুবরণ করতে হলো ?"তখন যমরাজা বলেছিলেন যে, তুমি ছোটবেলায় ছোটপ্রাণী নিরপরাধী ফড়িং-এর পাখা ছিড়ে ফেলায় মৃত্যু হয়েছিল, তাই তোমার মৃত্যুর কারণ ।

পদ্মপুরাণে আছে যে, এই অণি-মান্ডব্য ঋষিকে তাঁর প্রারব্ধ ভোগের জন্য, চুরির অভিযোগে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তার অসত্যতা প্রমাণ হওয়ায় অচিরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । স্কন্দপুরাণে আরেকটি কাহিনী আছে যে, - দেবপন্ন রাজার কণ্যার চুরির অভিযোগে মান্ডব্য ঋষিকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । ভাগ্যের করাঘাতে অনেককেই দুর্ভোগ ও কষ্টসহ্য করতে হয়,আবার সৌভাগ্যবশতঃ শান্তি এবং আনন্দও অচিরেই পাওয়া যায় । নৈমিষারণ্যের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার পথে "মড়ে-রুওয়া " স্থানটি মান্ডব্য ঋষির তপস্যা স্থলের অপভ্রংশ নাম ।

<u>মহাকবি কালিদাস</u>-এখানে বসেই "রঘুবংশ" মহাকাব্যটি লিখেছিলেন । ঐ কাব্যের ১৯ সর্গতে নৈমিষারণ্যের নাম উল্লেখ আছে এবং এই স্থানটির বিশেষ বর্ণনা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও প্রমাণ পাওয়া যায় । মহাকবি তুলসীদাস - ইনি অযোধ্যা হ'তে এখানে এসেছিলেন, এমনকি এখানে থেকেই "রামচরিতমানস" রচনা করেছিলেন । এই গ্রন্থটি উত্তরপ্রদেশের বহুলাংশেই প্রচারিত ও শ্রীরাম বিষয়ক প্রমাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত । উপরন্তু এই গ্রন্থটি ইতিহাস ও পুরাণাদির বহু কাহিনীতে সমৃদ্ধ । এই রামচরিতমানস ভারতবর্ষের ভিতর একমাত্র উত্তরপ্রদেশেই বাল্মিকী রামায়ণের পরিবর্তে ঘরে ঘরে প্রচলিত, তারপরেই বিহারে । পশ্চিমবাংলায় খুব কমই পঠিত হয় ।

নৈমিষারণ্যের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে রামপুর - মথুরা নামক স্থানে কুটীয়া বানিয়ে কিছুমাস বাস করেন এবং রামচরিতমানসের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন । তুলসীদাসজী নৈমিষারণ্য থাকাকালীন রামচরিতমানসের কিছু অংশ রচনা করেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায় ।

"তীর্থবর নৈমিষ বিখ্যাতা ।
অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা ।।"

গোমতীর পবিত্র জলে, মুনি-ঋষিদের দেহের অণু-পরমাণু,তাঁদের তপ-প্রভা মিশ্রিত থাকে, -- সকলেই শুধু স্নানের দ্বারাও দেহ-মন-প্রাণের শুদ্ধতা লাভ করে তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা যায় না । রামচরিতমানসে মনু-শতরূপার তপস্যার বর্ণনা এবং বিষ্ণুর দ্বারা তাঁদের পুত্র প্রাপ্তির বরদানের কথা লেখা আছে ।

৬০ নৈমিষারন্যে এসেছিলেন এমন রাজাদের বর্ণনা। ৫২

মহারাজা মনু(স্বয়ংভু)- সৃষ্টি এবং প্রলয়,দুইটিই একের পর অপর চক্রের মত চলতে থাকে । প্রত্যেক সৃষ্টির এক কল্পতে, এক মন্বন্তরেতে এক এক জন মনু । এইরকম ১৪টি মন্বন্তর হয়েছিল এবং ১৪টি মনু এসেছিলেন ।

পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায় স্বয়ম্ভু মনু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নৈমিষারণ্যতে গোমতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন । ঐ তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন চিত্তে স্বয়ম্ভু মনুকে বর প্রার্থনার জন্য বললেন, তখন মনু বললেন যে, আপনার পুত্র হয়ে যেন জন্মগ্রহণ করতে পারি । ইহাতে বোঝা যায় যে, নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় । সর্বপ্রথম নির্গুণ নিরাকার ভগবান দর্শন (বিষ্ণুর) নৈমিষারণ্যতেই সাক্ষাৎ হয়েছিল । এই পূণ্যভূমির প্রসাদরূপে বলা যায়, এই বিষ্ণুই ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের পুত্র হয়ে রামরূপে জন্মগ্রহণ এবং দ্বাপরেতে বৃষি বংশীয় বাসুদেবের পুত্ররূপে কৃষ্ণ হয়ে অবতরণ করেছিলেন ।

উপরন্তু, তুলসীদাসের রামচরিতমানসে উল্লেখ আছে যে, - পুত্রলাভের জন্যই রাজা মনু ও শতরূপা এই নৈমিষারণ্যতেই দীর্ঘবৎসর তপস্যা করে, ভগবান বিষ্ণুর বরদানে অবতার বরিষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন । সেজন্যই নৈমিষারণ্যকে সিদ্ধ তপোভূমি বলা হয় ।

দক্ষ-প্রজাপতি -স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বর খন্ডের মাধ্যমে জানতে পারা যায়, – একবার দক্ষ-প্রজাপতির উপস্থিতিতে সমস্ত মুনি-ঋষিগণ; সুরাসুরগণ দক্ষ-প্রজাপতিকে স্তুতি এবং বিধিযুক্ত পূজা করেন,কিন্তু মহাদেব ওখানে উপস্থিত থেকে তাঁকে কোনপ্রকার সম্মান তো দেখায়নি এমনকি উঠেও দাঁড়ায়নি, ইহাতে দক্ষ-প্রজাপতি এই প্রকার তিরস্কার হয়েছেন দেখে, ছুটে গিয়ে মহাদেবকে বললেন যে, - "দেবতা, যক্ষ, দানব, অসুরাদিগণ আমাকে সম্মান ও নমস্কার করলো অথচ, তুমি ভূত-প্রেত, পিশাচাদির দ্বারা সেবিত,আমাকে এইভাবে তিরস্কার - ফলে তোমাকে(মহাদেবকে) আমি অভিশাপ দিলাম, আজ থেকে কোন যজ্ঞে তুমি স্থান পাবে না ও তোমাকে কোন যজ্ঞতে কেউ নিমন্ত্রণ করবে না, তুমি যেমন নিম্নবর্ণের মত ব্যবহার করেছ, সেইরূপ তুমিও নিম্নবর্ণের মতই ব্যবহার পাবে ।" এ-কথা শুনে মহাদেব হাসতে লাগলেন কিন্তু নন্দী, ভিরিঙ্গীগণ ক্রুদ্ধ হওয়াতে মহাদেব নিজেকে শান্ত অবস্থায় আনলেন । দক্ষ-প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে

ঐ স্থান ত্যাগ করলেন। ঐ সময় হ'তে দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হলেন।

সেজন্যই দক্ষ প্রজাপতি তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হরিদ্বার - কন্‌খলে, শংকরকে (মহাদেবকে) নিমন্ত্রণ করেন নি। এমনকি কন্যা পার্বতীকেও নয়। এই অপমানেই পার্বতী অপমানিত হয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সুতরাং দক্ষ-প্রজাপতির শিবের(মহাদেবের) প্রতি শত্রুতাভাবের বীজ নৈমিষারণ্য থেকেই শুরু হয়েছিল।

<u>বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ</u> -বায়ু ও ব্রহ্মান্ড পুরাণ অনুসারে একবার এই নৈমিষারণ্যতেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বিবাদ হয়েছিল কারণস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শিষ্য বিশ্বামিত্র সাবিত্রী(গায়িত্রী) মন্ত্রতে সিদ্ধ হয়ে গুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবকে বললেন, — "গুরুদেব ! সাবিত্রী মন্ত্রতে তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছি এবং এই মন্ত্রের দ্বারা বহু প্রকারের শক্তি অর্জন করেই বল্‌ছি -আমি আজ ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণত্বে পৌছিয়াছি !" শিষ্য বিশ্বামিত্রের কথা শুনে, গুরু ব্রহ্মর্ষি উত্তর দিলেন – " কিছু সিদ্ধি আর বিভূতি লাভ করলেই ব্রহ্মত্ব বা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। " শিষ্য বিশ্বামিত্র ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গুরু বশিষ্ঠের উপর অপ-শক্তি আরোপ করাতে ঐ শক্তি কার্য্যকরী না হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলো, ইহাতে শিষ্য বিশ্বামিত্র দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হয়ে গুরু-পুত্রের উপর প্রয়োগ করাতে গুরু বশিষ্ঠের পুত্র "শক্ত্রি" প্রাণ হারালো। তারপর গুরু বশিষ্ঠও শিষ্য বিশ্বামিত্রকে বধ করার ইচ্ছাতে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতির অনুরোধে বশিষ্ঠ অনেকটাই ক্রোধ প্রশমিত করলেন এবং বিশ্বামিত্রের এক হিতৈষী বন্ধু বিভূকুন্দর ও গুরুপত্নী অরুন্ধতির জন্য বিশ্বামিত্র প্রাণে রক্ষা পেলেন। গুরু পুত্রের প্রাণ নাশ করায় অনুতপ্ত হয়ে, পুনরায় তীব্র তপস্যায় কাল কাটাতে লাগলেন। এই ঘটনাটি নৈমিষারণ্যের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার পথে বর্তমান "কৌলাহল বসেটী " নামক স্থানে। শিষ্য বিশ্বামিত্র যখন উগ্র তপ্যসায় রত, তখন গুরু বশিষ্ঠদেব নিজে উপস্থিত হয়ে শিষ্য বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হয়েছ বলে কাছে টেনে নিলেন।

<u>রাজা পুরূরবা</u> -বায়ু, শিব এবং ব্রহ্মান্ড পুরাণের মাধ্যমে রাজা পুরূরবার আগমন নৈমিষারণ্যতে যে হয়েছিল তা জানা যায়। বায়ু পুরাণেতে লেখা আছে৺— একমাত্র রাজা পুরূরবার শাসনকাল ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর এই নৈমিষারণ্যতেই হয়েছিল। তাঁর খুবই ধন-দৌলতের লোভ ছিল। দেবহুতির প্রেরণাতে এক

এক উর্ব্বশী এই রাজাকে পতিত্বে বরণ এবং স্ত্রী উর্ব্বশীর সাথে থাকা কালীনই উর্ব্বশীর প্রেরণাতেই নৈমিষারণ্যতে যজ্ঞ নষ্ট ও বাধা সৃষ্টি করেন। একদিন শিকার করতে এসে একটি স্বর্ণময় যজ্ঞশালা দেখেন এবং বিশ্বকর্মার দ্বারা স্থাপিত এই স্বর্ণময় যজ্ঞশালা রাজা পুরূরবার খুবই লোভ হয় ও এই যজ্ঞশালা দখল করতে চান। লোভী রাজার হাত থেকে এই যজ্ঞশালাকে বাঁচাবার জন্য মুনি-ঋষিগণ ক্রুদ্ধ এবং ক্ষোভে রাত্রীকালেই ঐ রাজাকে হত্যা করেন। রাজা পুরূরবার মৃত্যুর পর প্রজাসকলের, রাজার অভাব বোধ হওয়াতে উর্ব্বশীর পুত্র আয়ুকেই রাজা করে। রাজা আয়ু ছিলেন রাজা নহুষের পিতা। রাজা নহুষ যৌবনকালে সিংহাসনে বসেন ও ধর্মপরায়ণ রাজা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নৈমিষারণ্যের মুনি-ঋষিদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর উদারতার জন্য প্রজাকুল ও মুনি-ঋষিগণ অনায়াসেই যজ্ঞ করতে পারতেন, যজ্ঞে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি। ঐ সকল যজ্ঞতে অনেক মহান মুনি-ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন, যেমন —বৈখানস, প্রিয়মিত্র, বালখিল্য, মরীচি, যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ ও দেবগণ ইত্যাদি।

এই যজ্ঞের শেষের দিকে ভৃগুমুনি এসে শান্তিজল দিয়ে উত্তমরূপে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করান। তখন থেকে নৈমিষারণ্যতে অনেকবার যজ্ঞ হতো। রাজা পুরূরবার সময় রাজার দ্বারা যজ্ঞ হলেও তাঁর অত্যন্ত লোভ ও ধনলিপ্সার জন্য ব্যাঘাত হয়েছিল। রাজা আয়ুর শাসনকালে ভালভাবেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে - রাজা যদি লোভী হয়, তবে তাঁহার বিনাশ অবশম্ভাবী, এবং প্রজাকুলের নানাপ্রকার দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

<u>মান্ধাতার দ্বারা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ</u> -রাজা মান্ধাতা ইক্ষাকু বংশের রাজা বলে পরিচিত। তিনি এই নৈমিষারণ্য তপোভুমিতে বহুবার যজ্ঞ করেছিলেন।কথিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর কাছে হার স্বীকার করেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই -- রাজা মান্ধাতা নিজের বাহুবলে রাজ্যের বিস্তার করে নিজ পরাক্রমে সুশাসক ছিলেন। এমনকি ইন্দ্রের অমরাবতী থেকে তাঁর অযোধ্যা ধন-দৌলতে সমৃদ্ধিবান ছিল।

মহাভারতের শান্তিপর্ব হ'তে জানা যায় যে, রাজা মান্ধাতা দেবতাদের নিয়ে যজ্ঞ করে খুবই সুনাম অর্জন করেন।

<u>পান্ডবদের নৈমিষারণ্যে আগমন</u> - মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে — পান্ডবগণ নৈমিষারণ্যতে এসেছিলেন। গোমতীর উত্তরতটে,"পান্ডব টীলা" নামে

হনুমানজীর মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত । এখানে এসে পান্ডবগণ গুপ্তরূপে অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন তীর্থ, অভিষেক, গোদান ও ধনদান করেন । মুঘল শাসনকালে এখানকার মন্দির ও দুর্গ ভেঙ্গে দিয়ে,নিজেরা একটি দুর্গ বানিয়েছিল, এমনকি এখান থেকে ২৫০ গজ দূরে উচুস্থানে যে মসজিদটি আজ দেখা যায় সেটি মোঘল সম্রাট অরঙ্গজেবের প্ররোচনায় হয়েছিল এবং আজও যে সক্রিয় আছে তা স্পষ্টই দেখা যায় । সনাতন ধর্মের আদর্শ ও ঐতিহ্য এই যে পরধর্মকে কখনই অবজ্ঞা করেনি, মানবতার নিদর্শনস্বরূপ কোনরূপ আঘাত বা তাচ্ছিল্য পোষণ করেনি । ইংরেজরা এদেশে প্রায় ২০০ বৎসর রাজত্ব করেও কোন মসজিদ বা মন্দির জোড় করে ভাঙ্গেনি বা উচ্ছেদ করেনি ।

উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে — মহাভারতের বনপর্বে, স্কন্দপুরাণের বৈষ্ণবখন্ডে প্রভৃতিতে লেখা আছে ।

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ -সকল ভক্তগণই ভক্তপ্রহ্লাদের নাম জানেন । এই ভক্তপ্রহ্লাদ অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করেও ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন । তাঁর পিতার নাম ছিল হিরণ্যকশ্যপ, পিতার মৃত্যুর পর ভক্ত প্রহ্লাদ সিংহাসন লাভ করার পর তাঁর তীর্থাদিতে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, -- নিজের কুলগুরু শুক্রাচার্য্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শ্রেষ্ঠ তীর্থ ধরাতলে কোনটি ? তখন গুরু শুক্রাচার্য্য বললেন " ধরাতলে নৈমিষারণ্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত, পাতালে চক্রতীর্থ এবং আকাশেতে পুষ্করতীর্থ ।"

রাজা প্রহ্লাদ গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশ পেয়ে, সঙ্গী-সাথী নিয়ে নৈমিষারণ্য তীর্থে পৌছিলেন । ওখানে চক্রতীর্থের পবিত্র জলে পরিজন, সাথী-সঙ্গীদের সাথে স্বচ্ছ জলে তৃপ্তি লাভ করেন । এমনকি ঐ নৈমিষারণ্যতেই ভগবান বিষ্ণুর দর্শন পান, তারপর দেবদেবেশ্বর স্থানটীতে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন হয় । এরপর গয়াত্তর গ্রামেতে গদাধরের দর্শন লাভ হয় ।

দৈত্যরাজ বাণাসুর দ্বারা নৈমিষারণ্যতে শিব-লিঙ্গ স্থাপন — বর্ত্তমানে দেবদেবেশ্বর মন্দির থেকে একটু এগিয়ে গোমতী নদীর আগেই একটি শিব-লিঙ্গ এবং স্ফটিকের শিবলিঙ্গ আছে, এই শিব লিঙ্গটি দৈতরাজ বাণাসুরের দ্বারাই স্থাপিত । মোঘলের রাজত্বকালে সম্রাট অরঙ্গজেবের এবং কালাপাহাড়ের দ্বারা অনেক মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল । সেই সময় এই শিব-লিঙ্গটিকে কুঠারের আঘাত দিলেও ভাঙতে পারেনি । এখনও কুঠারের অনেক আঘাত-চিহ্ন আছে ।

এ-স্থানটির নাম দেবদেবেশ্বর। রুদ্রাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্যের ভিতরেই মিশ্রিখতীর্থে যাওয়ার পশ্চিমে দেড় কিঃমিঃ দূরে বাদিকের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়,– এই স্থানটি অরবাপুর গ্রামের নিকটে, বড়-বড় চেনা গাছে পরিপূর্ণ,শান্ত পরিবেশ তপস্যার প্রকৃত পরিবেশ, দোকানাদি খুবই অল্প, গ্রামের ভিতরও নির্জনস্থান এবং অনেকেরই জানা নেই জন্য তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা কম থাকে।

<u>চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের গণপতির স্থাপনা</u>-নৈমিষারণ্যে "চক্রতীর্থ "জলাশয়ের পশ্চিমতীরে গণপতির একটি ছোট মন্দির আছে। যেখান হ'তে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা শুরু হয়। এখানকার গনেশের মন্দিরটি বিক্রমাদিত্যের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল,এই মন্দিরের ভিতরেই একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেখতে অতি প্রাচীন বলেই মনে হয় সকলেই এই মন্দিরকে বিক্রমাদিত্যের মন্দির বলে জানে।

<u>অহল্যাবাঈ দ্বারা চক্রতীর্থের জীর্ণদ্বার মেরামত</u> - হোলকরের মহারাণী অহল্যাবাঈ নৈমিষারণ্য এসে চক্রতীর্থরে জীর্ণ অবস্থা দেখে পুনঃরায় ইহাকে নির্মাণ করান এবং ইহার কিনারে একটি ধর্মশালা স্থাপনা করিয়েছিলেন। এই ধর্মশালা চক্রতীর্থের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আজও বর্তমান।

<u>লিঙ্গধারিণী ললিতাদেবী বা ত্রিপুরাসুন্দরী</u> – এ অঞ্চলেতে এই স্থানকে সতীপীঠ বলা হয়। শক্তিপীঠরূপে দেবী ভাগবতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রগ্রন্থতে উড্ডীয়ন -পীঠরূপে উল্লেখ আছে, কোথাও কোথাও এই পীঠকে "জালন্ধর" বলেও অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে,স্কন্দপুরাণের অবন্তী-খন্ডে, বৈষ্ণবখন্ডে লিঙ্গধারিণী ললিতা বা ষোড়শীর কথা লেখা আছে। কোথাও কোথাও ললিতাকান্ত এবং স্তোত্র বল্লবীর রচনাকার পদ্মশ্রী বলে সম্বোধিত করেছেন, কিছু কিছু লেখক শান্তা, সুমঙ্গলা নামে অভিহিত করেছেন তাও উল্লিখিত আছে।

সে যাই হোক না কেন, যে নামেই ডাকা হোক না কেন - এই নৈমিষারণ্যে ললিতাসিদ্ধ স্থানটীতে প্রতিদিন ভক্তদের বেশী ভিড় হয়ে থাকে। এখানকার যজ্ঞকুন্ডতে দিন-রাত অখন্ডরূপে অগ্নি সংরক্ষিত। যে কোন ভক্ত অনায়াসেই আহুতি দিতে পারে। নিকটেই কাশ্যপী গঙ্গাকে ছোট কুন্ডের আকারে দেখা যায়, কাশ্যপমুনির তপস্যাস্থলটিও উঁচু স্তুপাকারে একটু দূরেই দেখা যায়।

সংকর্ষণ বলরাম কর্ত্তৃক লোমহর্ষণ সূত বধ-কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সকল রাজারাই য কোন পক্ষে(পান্ডব অথবা কুরুপক্ষ) যোগদান করে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সংকর্ষণ বলরাম কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগদান না করে, স্ত্রীকে(রেবতীকে) সঙ্গে করে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে গেলেন।

যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, — পান্ডব পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুপক্ষে দুর্যোধন, দুইজনেই সংকর্ষণ বলরামের খুবই আপনজন। যুদ্ধে লোকক্ষয় নিশ্চয়ই হয়, উপরন্তু এক পক্ষের জয়, অপরপক্ষের পরাজয় অনিবার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ছোটভাই,তাঁর আদরের ; তেমনি আবার দুর্যোধনের যুদ্ধবিদ্যার (গদা) গুরু এই সংকর্ষণ বলরামজী ছিলেন। তাই উভয়সঙ্কট বিবেচনা করে তীর্থ ভ্রমণে মনস্থ করেছিলেন। এই যাত্রাকালে সংকর্ষণ বলরাম পথিমধ্যে "বল্বল"নামক এক রাক্ষসকে বধ করেছিলেন। এই রাক্ষস বিলগ্রামে(বর্ত্তমানে) বাস করতো।

বিভিন্ন পুরাণাদিতে স্পষ্ট লেখা আছে, - সংকর্ষণ বলরামজী তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে নৈমিষারণ্যেতে এসেছিলেন।

মহাভারতে - বনপর্বতে ;মার্কন্ডেয় পুরাণে ;কল্কিপুরাণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে পত্নী রেবতীর সাথে তিনি রৈবতক উদ্যানেতে পৌছান,— ওখানে রমণীয় মহাবন দেখেন, সেখানে নানারূপ পাখীর কলোরব শুনে মুগ্ধ হন,বহু-প্রকারের বিচিত্র বৃক্ষরাশি, লতাগুল্ম, নানা জায়গায় পুষ্পে সুশোভিত, বড়-বড় জলাশয়ে পূর্ণ। তারপর সংকর্ষণ বলরামজী দেখলেন্ — বেদ-বেদান্তে পারদর্শী উচ্চবংশীয়, কুশীক বংশীয়, ভৃগু বংশীয়, ভরদ্বাজ বংশীয় ও গৌতম বংশীয় মুনি-ঋষিগণকে, তাঁদের মধ্যে উচ্চসনে বসে সূতজী পাঠক হয়ে,— পুরাণ কথা শোনাচ্ছেন। সংকর্ষণ বলরামজীকে দেখতে পেয়ে সমস্ত মুনি-ঋষিগণ দাঁড়িয়ে বলরামজীকে স্বাগত জানালেন,কিন্তু সূতজী আসন ছেড়ে উঠে স্বাগত জানায়নি জন্য সুরাসক্ত বলরামজী ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে - সূতজীকে তলোবারি দিয়ে মুন্ড ছেদন করে ফেললেন। বলরামজীর দ্বারা এরূপ ঘৃণিত কাজ দেখে সমস্ত মুনি-ঋষিগণ নৈমিষারণ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে সমস্ত মুনি-ঋষি বাইরে চলে যাওয়াতে বলরামজী খুবই দুঃখিত ও বিমর্ষ হয়ে নিজেকে নিজেই ধীক্কার দিয়ে নৈমিষারণ্য থেকে অন্যত্র তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

❋ গৃধ্র-জম্বুক আখ্যান (শকুন-শিয়াল)। ❋

মহাভারতের শান্তিপর্বতে আপধর্ম পর্ব হ'তে শকুন ও শৃগালের কথা লেখা আছে। ভীম বলিল, হে কুন্তীপুত্র ! পুরাকালে নৈমিষারণ্যতে শকুন ও শৃগালের কথার ইতিহাস বলা হতো, আমি বলছি তা শোনো -- এখানকার কিছু লোক এক মৃত বালককে নিয়ে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়ে শোকে কাঁদতে লাগলো। ঐ লোকেদের করুণ কান্না শুনে, এক শকুন উপস্থিত হয়ে বললো - তোমরা এই মৃত বালককে শ্মশানে রেখে চলে যাও, এ বালকটি তো মরে গেছে, তাতে শোক-কান্নার কি আছে ? ব্যর্থ বিলাপ করে কোন লাভ নেই, এ সংসার সুখ ও দুঃখের মিশ্রিতরূপ। জন্ম ও মৃত্যু সংসারের নিত্যলীলা। জন্ম ও মৃত্যুর জন্যই এ সংসারের সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এই ঘোর শ্মশানে তোমাদের থাকা উচিৎ নয়। যে ব্যক্তির কালের কবলে মৃত্যু হয়েছে, শোক করে ও কেঁদে তাকে পুনরায় জীবিত করা কখনও সম্ভব নয়। সকল প্রাণীমাত্রেরই এরূপ গতি হয়ে থাকে। জন্ম হলে মৃত্যু অবশম্ভাবী, " জাতস্য ধ্রুবম মৃত্যু "। কাজেই সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তোমরা সব লোক তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও।

শকুনের একথা শুনে সকলেই মৃত বালককে ওখানে রেখে গৃহে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিতে ছিল তখন হঠাৎ শিয়াল এসে উপস্থিত হয়ে বললো -- তোমরা তো খুবই দয়াহীন লোক এবং মূর্খও ! এখনও তো সূর্য্য অস্ত যায়নি, বাচ্চটিকে স্নেহ কর, ভয় করোনা। সূর্য্য ডোবার মূহুর্ত্তটি খুবই ভাল। এই শুভ মূহুর্ত্তের প্রভাবে এই মৃত বালকটির পুনঃজীবিত হওয়া, কোন অসম্ভব নয়। তোমরা নির্দয় হয়ে মৃত বালকটিকে শ্মশানে ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ,ব্যর্থ বিলাপে কোনই লাভ হয় না। পশু-পক্ষী প্রভৃতি নিজের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে,-- তারা কোন ফলের আশা না করেই পুত্র-কণ্যাদি লালন-পালন করে কর্ম করে সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু মানুষেরা তো পুত্র-কণ্যাদি লালন-পালন করে ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য এমনকি পারলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা(শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) সুখ-সমৃদ্ধি লাভের আশায়। সুতরাং তোমাদের প্রিয়পাত্রকে ছেড়ে কোথাও না যাওয়াটাই শ্রেষ্ঠ মনে করি। উপরন্তু আমাদের শাস্ত্রে আছে যে দুর্ভিক্ষে বা বিপদে,রাজদ্বারে (অভিযুক্ত),এবং শ্মশানে যে সাহায্য করে,-- সেই প্রকৃত বন্ধু। তাছাড়া অন্য কেউই বন্ধু হ'তে পারে না। তাই এই সুন্দর বালকটিকে ছেড়ে যেতে -

তোমাদের দয়া হচ্ছে না ? এই প্রকার শৃগালের কথা শুনে, সমস্ত লোক মৃত বালকের শরীর রক্ষার জন্য ফিরে এলো শ্মশানেতে। পাশেই অপেক্ষা করছিল, ক্ষুধার্থ ঐ শকুন। ঐ শ্মশানেতে পুনঃরায় ঐ লোকেদের ফিরে আসতে দেখে সে বলে উঠলো — ওহে ! মূর্খ মানুষগণ ! তোমরা ওই অল্পবুদ্ধি, ক্রুর এবং ক্ষুদ্র শৃগালের কথা শুনে এই শ্মশানে থাকছো ? ভালোকরে বিচার-বিবেচনা করো যে, এই মৃত বালকটির পিছনে থাকাটা শুধু কষ্টই হবে এবং দুঃখ ও বিলাপে ভেঙ্গে পড়বে, তাছাড়া কিছুই শুভ ফল হবে না। এখন তোমরা ঘরে ফিরে গিয়ে তপস্যা করো,তপস্যার ফলে হয়তো এই বালকের পুনঃজ্জীবন হতে পারে। এমনকি তপস্যার দ্বারা পুত্র-লাভ,ধন-রত্ন,সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হয়ে থাকে। যে প্রাণী যেমন কর্ম করে, সে তেমনি ফল পেয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কর্মফলেই পেয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ নিয়েই সমস্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা গৃহে ফিরে গিয়ে সকলেই ধর্মাচরণ কর,অধর্ম ত্যাগ কর, দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা কর তাতে অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঘরে ফিরে আসবে। কাজেই মৃত বালককে শ্মশানে রেখে মায়া ত্যাগ করে যত তাড়াতাড়ি পার এ শ্মশান তাগ করে চলে যাও। মৃত বালকের জন্য শোক করে কোন লাভ হবে না। সংসারেতে দেখা যায় যে গর্ভস্থ শিশু,বালক,পৌঢ়,বৃদ্ধ প্রভৃতির মৃত্যু অবসম্ভাবী এবং সময়সাপেক্ষ।

শকুনের কথা শুনে, বিশ্বাস করে - সংসারের এইরূপী সত্য নিয়ম মেনে সকলেই ঘরে ফিরে আসার জন্য তৈরী হতে লাগলো। তখন শৃগাল পুনঃরায় মানুষদের থামতে বলে,আবার মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো - এই শকুন বৃথা বাক্য বলেছে,সেজন্য তোমরা চলে যাচ্ছ কেন ? আমি বলছি যে, কখনও এই প্রাণহীন অসহায় বালককে ছেড়ে চলে যেওনা। কখনও কখনও দৈবকৃপাবশতঃ মৃত ব্যাক্তিও জীবিত জয়ে যায়। শাস্ত্রে আছে ১) সাবিত্রী তাঁর স্বামী সত্যবানকে দেবকৃপাতে বাঁচিয়েছিল। ২) শম্বক দ্বারা বধ হয়েছিল একটি ব্রাহ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বাঁচিয়েছিলেন। ৩) সেইরূপ রাজর্ষি শ্বেতের ছোট ছেলের মৃত্যুর পর, রাজর্ষি শ্বেতের ধর্মনিষ্ঠার জন্য এবং তপোবলে ঐ মৃত ছেলেও বেঁচে উঠেছিল। কাজেই এই মৃত ছেলেটিকে ছেড়ে যেওনা, হয়তো তোমাদের করুণ কান্না শুনে বা আর্ত্তনাদে কোন মুনি-ঋষি বা দেবতা তোমাদের প্রতি দয়া করে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

ভীষ্মদেব পান্ডবপুত্রগণকে বললেন - শৃগালের এরূপ কথা শুনে শোকাকুল আত্মীয়স্বজন ঘরে ফিরে না গিয়ে মৃত বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে বার বার বিলাপ করতে লাগলো। তারপর শকুন ওখানে উপস্থিত হয়ে আবার পুরাণাদি

ও শাস্ত্রের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো এবং উহাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বুঝালো। শকুন ঈর্ষান্বিত হয়ে আরও অনেক কিছু বললো - শৃগাল যদি শত-সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে, তবুও এ মৃত বালকটিকে বাঁচাতে পারবে না। যদি শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বরদান করে,তবে জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা মৃত বালকটি বেঁচে উঠবে।

শকুনের এরূপ কথা শুনে ঐ আত্মীয়স্বজন মনে করলো আমরা সবাই ব্যর্থ বিলাপ ও কান্না করছি, এতে কোনই লাভ হবে না, কাজেই এ মৃত বালককে ছেড়ে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হতেছিল, তখন পুনঃরায় শৃগাল এসে ঐ আত্মীয়স্বজনকে নানাপ্রকার বুঝিয়ে বললো - আমার একান্ত বিশ্বাস ও অনুভব হচ্ছে যে, রাত্রীতে এই স্থানে থাকলে নিশ্চয়ই এই বালক জীবিত হয়ে তোমাদের সকলকে সুখী করবে। অতএব তোমরা সকলে এ স্থান ছেড়ে কখনও অন্যত্র যেও না।

ভীষ্মদেব পান্ডব-পুত্রগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, - ঐ শৃগাল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এই প্রকার অমৃতের মত, ধর্মবিরোধী কথা বুঝাচ্ছিল এবং ওখানে শকুনও নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য, ঐ প্রকার ধর্মকথা বলেছিল। দু'জনেই (শকুন ও শৃগাল) ক্ষুধার্থ ও লোভবশতঃ নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধিতে মেতে উঠেছিল। শৃগাল মনে করেছিল যে, সূর্য্য অস্ত গেলেই আমার খাবার(খাদ্য) মিলে যাবে, সেইরূপ শকুন ভাবেছিল, দিন থাকতে থাকতে আত্মীয়স্বজন মৃত বালককে রেখে চলে গেলেই আমার খাওয়ার সুবিধা হবে। সেই জন্যেই শৃগাল বলেছিল - যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূর্য্য অস্ত যায়(ডুবে যায়) সেপর্য্যন্ত মৃত ছেলেটিকে নিয়ে আদর কর, এবং মাংসাসী শকুনের কথা শুনতে নেই। উভয়েই পরস্পর বিবাদ করেছিল। শকুন বলেছিল এখনও সূর্য্য অস্ত যায়নি এবং শৃগাল বলেছিল যে, সূর্য্য ডুবে গেছে।

শকুন ও শৃগাল দু'জনেই নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ মৃত বালকের মাংস খাওয়ার জন্য শাস্ত্রকথা উল্লেখ করে পরস্পর যখন ভীষণভাবে ঝগড়া করছিলো, - তখন ভগবান শিব দয়া করে ঐ আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রকটিত হয়ে, ঐ মৃত বালককে অনুগ্রহ ও কৃপা করে জীবিত করে দিয়েছিলো। এমনকি ঐ মৃত বালককে জীবিত করে একশত বৎসর জীবিত থাকার জন্য বরদান দিয়ে, ওখান থেকে অর্ন্তহিত হয়ে গেলেন। মৃত বালককে জীবিত অবস্থায় পেয়ে আত্মীয়-স্বজন আনন্দিত হয়ে গৃহে চলে গেল।

ভীষ্মদেব পান্ডবদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, — ধৈর্য্য,উৎসাহ এবং বিশ্বাস-

ও একাগ্রভাবে শিবকে প্রার্থনা করলে, অতিশীঘ্রই মহাদেব শিব(আশুতোষ) সকলের প্রার্থনার ফল দান করে থাকেন। নৈমিষারণ্যের উপাখ্যানেতে ভগবান শিবের মহিমা অবর্ণনীয়, শিবের কৃপা প্রসাদ পেয়ে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যায়। দেবদেবেশ্বর শিব অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করে থাকেন। কাজেই নৈমিষারণ্যতে শিবকে দেবদেবেশ্বর বলা হয় ;সুতরাং নৈমিষারণ্যের দেবদেবেশ্বর শিবের স্থানটী গ্রামের ভিতর হলেও মাহাত্ম্যপূর্ণ।

❋মহাকাল ও করন্ধম্ আখ্যান❋

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তিনই অভিন্ন। একবার করন্ধম ঋষির মনেতে এই প্রকারের বিচার উৎপন্ন হলো কিন্তু, কিছু লোক ব্রহ্মার আশ্রয় নিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলো, অন্য কিছু লোক বিষ্ণুর আশ্রয় নিয়ে বিষ্ণুর উপাসনা করতে লাগলো, - ইহারাই একমাত্র মোক্ষদাতারূপে প্রচারিত হলো। এর ফলে করন্ধম ঋষির মনে সংশয় উৎপন্ন হওয়ায়, সংশয় হ'তে নিবৃত্তি লাভের জন্য শিবের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন -- হে প্রভু ! আমার মনের সংশয় দূর করুন। তখন মহাদেব(শিব) করন্ধম ঋষিকে বললেন যে, প্রত্যেক দেবতারই অপার মহিমা কাহাকেও ছোট-বড় বলা চলে না। মুনি-ঋষিগণও দেবতাদের বিষয়ে সম্যক্‌ভাবে জানেন না। দেবতাদের কার্য্য অভাবনীয়,অসীম, অব্যয়, অব্যক্ত। আরও বললেন --যে ব্যক্তির যে দেবতার উপর অনুরাগ,ভক্তি ও শ্রদ্ধা হয়, সেই দেবতাকে পূজা, ধ্যান-জপাদি করলে সবই সিদ্ধ হয়,কারণ সকল দেবতাদের নামের একই শক্তি। যে সমস্ত মানুষ দেবতাদের মধ্যে কে উত্তম ? কে মধ্যম ? কে অধম ? বিচার করে, সে সকল ব্যক্তি সত্যই মূর্খ্য, মল ও আবরণে দুঃখ-কষ্ট পায়। কোন দেবতাই না তো ছোট, না বড়, ইহাই নৈমিষারণ্যের মুনি-ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত সত্য যে, – যিনি ব্রহ্মা, যিনি বিষ্ণু, – তিনিই শিব। ইহা স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা এবং সংহার কর্ত্তার কার্য্যভেদ মাত্র। কিন্তু ইহাদের মূলরূপ একই।

❋চিত্রাঙ্গদা এবং রাজা সুরথের কাহিনী❋

বামন পুরাণেতে নৈমিষারণ্যের ঘটনাবলী এবং কাহিনী খুবই সুদৃঢ়রূপে স্থান পেয়েছে। প্রাচীনকালে বিদর্ভ দেশের একজন রাজার নাম ছিল সুদেব। তাঁর এক পুত্র ছিল, নাম সুরথ, সুরথ খুবই বুদ্ধিমান এবং সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন।

নৈমিষারণ্যতে শিকার করতে এসে সুরথ গোমতী নদীর তীরে পৌছান। ঐ সময় বিশ্বকর্মার কণ্যা চিত্রাঙ্গদা সখীদের নিয়ে গোমতী নদীর জলে খেলায় মত্ত

থাকাকালীন, রাজা সুরথের হঠাৎ চিত্রাঙ্গদাদের উপর দৃষ্টি পড়ে এবং স্নানবতা চিত্রাঙ্গদাদের রূপ-লাবন্যে আকৃষ্ট হয়ে ঐ গোমতী নদীতীরে মুর্চ্ছিত অবস্থায় অচেতন হয়ে মাটীতে পড়ে যায়। ঐ সময় চিত্রাঙ্গদা ও তাঁর সখীদল রাজা সুরথের অচেতন অবস্থা দেখতে পেয়ে, নানারূপ সেবার দ্বারা রাজা সুরথকে সুস্থ করে তোলে। এমনকি চিত্রাঙ্গদা রাজা সুরথের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, বিবাহের প্রস্তাব দেয়। চিত্রাঙ্গদার সখীরা এতে অসন্মত হয়ে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

যখন চিত্রাঙ্গদার পিতা বিশ্বকর্মা এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি কণ্যা চিত্রাঙ্গদাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, — " তুমি স্ত্রী-স্বভাববশতঃ ধর্মকে ত্যাগ করে, নিজে নিজেই স্বামীরূপে রাজা সুরথকে বরণ করে নিয়েছ,আর তোমার কখনও বিবাহ হবে না। বিবাহ না হওয়ায়, তুমি স্বামী এবং পুত্রসুখ কখনই পাবে না।" যেই শাপ দেওয়া হয়েছে, তখনি নদীর জলে পড়ে ভেসে গেল। এই অবস্থা দেখে চিত্রাঙ্গদা মুর্চ্ছিত হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। পরবর্ত্তীতে সখীদের ও রাজা সুরথকেও দেখতে পেল না। তখন মনের দুঃখে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলো, হঠাৎ দৈববাণী হলো - " তুমি রাজা সুরথকে অবশ্যই পাবে, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হও।" তারপড় রাজা সুরথের সাথে চিত্রাঙ্গদার মিলন হয়েছিল। আরও বিস্তারিত বিবরণ বামন পুরাণে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে — ৩৪২/২-এতে লেখা আছে।

❋ মুনি ধর্মারণ্যের কাহিনী ❋

মহাভারতের শান্তিপর্বতে মুনি ধর্মারণ্যের গল্পও নৈমিষারণ্যতে বহুল প্রচারিত ছিল। এ গল্পটী সংক্ষিপ্ত ভাবেই লিখছি —পুরাকালে গঙ্গার সুরম্যতীরে, মহাপদ্মপুর নামে একটি স্থান ছিল, --ওখানে ধর্মারণ্য নামে একজন নিষ্ঠাপরায়ণ ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি অক্রোধী,বেদপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁর সংসার স্ত্রী-পুত্র-কণ্যা এবং ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ থাকাতে, সংসার ধর্ম পালনের ভাড় নিজ পুত্রের উপর সমর্পন করে লৌকিক সংসার ধর্ম হ'তে বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক কাজে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন।

একদিন একমনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, কি কাজে লিপ্ত থাকলে নিজের কল্যাণ হবে ? আমার প্রকৃত কাজ কি ? আমার কোন ধর্ম অবলম্বন করা উচিৎ ? কিছু স্থির করতে না পেরে, এইসব চিন্তা করতে করতে নিজের মনে ভারাক্রান্ত হয়ে নিজে নিজেই দুঃখ পেতে লাগলেন। হঠাৎ দৈববশতঃ ঐ - কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রাহ্মণের ঘরে একজন অতিথিরূপে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলো এবং

তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে যথাসাধ্য অতিথি সৎকারের পর - প্রণামপূর্ব্বক বললেন যে, হে অতিথি নারায়ণ ! আমি পুত্র উৎপাদন পর্য্যন্ত গৃহস্থধর্ম পালন করেছি, এখন কোন্ পরমধর্মের পালন করবো বা কোন্ পথের আশ্রয় নেব ? আমার আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, একান্ত থাকার ইচ্ছা, কিন্তু সংসারের বিষয়পাশ এতো প্রবল যে, কোনকিছুই করতে পারছি না । কিন্তু এখন পারমার্থিক পথ-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টায় আছি ।

দয়া করে আমাকে বলুন যে ,কি করলে সংসার ভবসাগর হ'তে কোন নৌকার মাধ্যমে সহজেই পার হতে পারি ? দেখছি যে,সংসারে সাত্ত্বিক পুরুষও দুঃখ-যন্ত্রণা এবং বিষয়-বাসনায় পীড়িত হয়ে থাকে । পরিব্রাজকগণও অন্য লোকের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে থাকে ক্ষুধার তাড়নায় । হে অতিথিনারায়ণ ! অনুগ্রহ করে আমাকে উপযুক্ত পথ বলে দিন ।

ধর্মারণ্য নামক ব্রাহ্মণের এরূপ বাক্য শুনে অতিথি ব্রাহ্মণ মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন - আমিও এ বিষয়ে বহু বৎসর ধরেই চিন্তা করছি - সাধনপথ ও নির্দ্দেশ এবং .মোক্ষ কিরূপে লাভ করা যায় ? কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছি না । এমনকি,আমাদের যেমন অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ আছে, তেমনি ধর্মের সাধনপথও বহু, কাজেই নানাদিক থাকে নানাভাবে দিশাহারা । উপরন্তু কিছু সংখ্যক ধার্মিক তো মোক্ষলাভের পক্ষে প্রশংসা করে থাকে, আবার কোন কোন্ লোক - বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে ধর্মরত থাকেন, কিছু কিছু লোক কেবল গৃহস্থাশ্রমকে পরমসাধন বলে স্বীকার করেন, কোন কোন লোক শুধু গুরুশুশ্রষা, কিছু মৌনব্রত, কিছু মাতা-পিতার সেবার দ্বারা স্বর্গলাভ হয় মানেন, আবার কিছু লোক অহিংসা এবং সত্যকে আশ্রয় করে পরমপ্রাপ্তি লাভ করেন, উপরন্তু কিছু লোক যুদ্ধ করে মরে যাওয়াকে স্বর্গে পৌছানোর কথা মানেন, বহুলোক আবার উনছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে স্বর্গগামী হয়ে থাকে ।

হে ব্রাহ্মণ ! যেমন বায়ুর বেগেতে বৃষ্টি এদিক-ওদিক যায়, সেইরূপ সংসারে অনেক ধর্মের কথা শুনে আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং দয়া করে আমি নির্দিষ্ট ধর্মপথে সাধন করতে পারি সেজন্য আমাকে সঠিক সাধনপথে চলার জন্য, ধর্ম-উপদেশ দান করুন । কিন্তু ব্রাহ্মণ ! আমার গুরুদেব যেরূপ আমাকে তাত্ত্বিক উপদেশ দিয়েছেন, সেই অনুসারে তোমাকে বলছি, তুমি মন দিয়ে শোন ।

প্রাচীনকালে যে স্থানে ধর্মচক্র(চক্রতীর্থ) পড়েছিল সে স্থানের নিকট গোমতী নদীর তীরে নাগপুর নামে একটি নগর আছে, ঐ স্থানে সকল দেব-দেবীগণ যজ্ঞ করছিলেন, এমনকি ঐ স্থানে রাজা মান্ধাতা যজ্ঞ করে দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও

মহান হয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে একজন মহান মহাত্মা পদ্মনাভ নামে বাস করেন, তিনি কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা তিনটী উপায়ে মানুষকে উপদেশ দিয়ে দেহ-মন-প্রাণকে শান্ত করে দিতে পারেন, কাজেই নৈমিষারণ্যতে গিয়ে ঐ পদ্মনাভ নাগরাজার কাছে হিতোপদেশ পেয়ে তোমার আনন্দ ও শান্তি পাওয়া খুবই সম্ভব।

যিনি কামনা-বাসনা ত্যাগ করে, একমাত্র শরণাগতি হয়ে যোগস্থ কর্ম করেন, তিনিই একমাত্র সুখ-শান্তি লাভ করেন, ইহাতে কোনরূপ বিভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কাই নেই।

নৈমিষারণ্যতে মন্দির ও আশ্রম।

অখন্ডধাম -স্বামী অচ্চিত্তানন্দ মহারাজের দ্বারা ১৯৭৭ সনে স্থাপিত হয়েছে। বর্ত্তমানে বাস টার্মিনাসের উত্তর দিকে।

অযোধ্যামন্দির - পবিত্র সলিলা গোমতী নদীর পূর্বদিকে মৌনীবাবার দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, পূর্ব্বে খুবই সুন্দর ছিল এখন রক্ষনাবেক্ষণের অভাববশতঃ প্রায় ভগ্নদশায় পরিনত হয়েছে।

অহীবিল-মঠ (নৃসিংহ মন্দির)- গোপাল মন্দিরের নিকটেই পূর্বদিকে এই মন্দির অবস্থিত। ইহার সংস্থাপক অহীবিল স্বামী। কখনও কখনও ইহাকে রামানুজস্বামী মঠ বা দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজী মঠ নামেও বলা হয়। এখনও নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছে, সকাল - সন্ধ্যায় পূজা এবং ভোগ আরতি হয়।

আজাদ-আনন্দাশ্রম - ১০৪ বৎসর বয়সে স্বামী রামানন্দ পরমহংস এই মঠটী স্থাপন করেন, ১৯২৪ সালে গোমতী নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপূর। এই রামানন্দ স্বামীজী সুরোলে স্বামী নামেও পরিচিত ছিলেন। যে সময়ে তিনি এখানে এসেছিলেন তখন দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিম দিকে শ্মশান ছিল, এখন সে শ্মশান আর নাই।

উড়িয়া স্বামীর আশ্রম -প্রসিদ্ধ দিগম্বড় স্বামী এই উড়িয়া বাবার তপস্যার

প্রভাবে এখনও এই স্থানটী তেজোময় আছে । রাস্তার ধারে অনেকগুলি সন্ত মহারাজদের সমাধি আছে । বড় বটবৃক্ষটি এখনও ধ্যানরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । আমি ১৯৭৫ সালে এই আশ্রমেতে ছিলাম, এখনকার মহন্ত উড়িয়াবাবা খুবই প্রেমী ছিলেন, আমাকে আনন্দ সহকারেই আশ্রয় দিয়েছিলেন । এমনকি আমি যখন দু'বার নৈমিষারণ্যের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমায় বাহির হই, তখন এই উড়িয়াবাবাকে পাল্কীতে চলাচল করতে দেখেছি এবং আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বহু কথপোকথন হয়েছে । তাঁকে তপঃসিদ্ধ সাধু ও খুবই মিষ্টভাষী বললেও বেশী বলা হবে না । এই আশ্রমে বেদব্যাসের নামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা ছিল । কাজেই নৈমিষারণ্য উত্থানের জন্য আশ্রমটি প্রসংশনীয় ছিল বলা যায় ।

কমলকুঞ্জ আশ্রম - ইহা একটি বৈষ্ণবাশ্রম,১৯৬৭ সালে এই আশ্রমটি যতিরাজাচার্য্য দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল । রামানুজ কোট বা নৈমিষনাথ মন্দিরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত । এখানে বালগোপালের ছোট একটি মন্দির আছে ।

কশ্যপমন্দির -ব্যাস-গদ্দীর সন্নিকটেই একটি ছোট মন্দির আছে, - ঐ মন্দিরের নিকটেই কশ্যপমঠ নামেও পরিচিত একটি মঠ আছে । জনশ্রুতি আছে যে কশ্যপমুনি এবং তাঁর স্ত্রী অদিতি এখানেই তপস্যা করেছিলেন । যেখানে কশ্যপীগঙ্গা নামে একটি ছোট কুন্ড আছে – কথিত আছে, কশ্যপমুনির তপস্যার প্রভাবে গঙ্গা এখানে এসেছিলেন ।

কাশীকুন্ড -এখানে একটি কুন্ড আছে এবং পশ্চিমদিকে একটি মন্দির আছে, তাহাতে অন্নপূর্ণার পূজা হয় । এখানে পিতৃযজ্ঞের ব্যাবস্থা আছে এবং এখানে লোক মৃত পিতার মূর্ত্তি বানিয়ে পুড়িয়ে থাকেন ও মনে করেন যে, – কাশীতেই মৃত পিতাকে দাহ করা হলো । এখানে একটি ছোট শিবলিঙ্গও আছে ।

কেশব দাস আশ্রম -বারাবংকী জেলার কেশব দাসজীর দ্বারা এই আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল । ইহা বৈষ্ণব আশ্রম বলে পরিচিত - এখানে রাম-সীতা ও লক্ষণের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে । সন্মুখে হনুমানজীর মূর্ত্তি । ইহা কূর্মি আশ্রম বলেও পরিচিত ।

গঙ্গাদাস আশ্রম-প্রাচীন ললিতাদেবীর মন্দিরের উত্তরদিকে অবস্থিত । ইহার

মহন্ত হরিদাসজী। আশ্রমটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তৈরী। এখানে শিব মন্দির এবং রাম-জানকীজির মন্দির আছে। বৈষ্ণব সন্তদের থাকার জায়গাও এখানে আছে।

গড়রিয়া আশ্রম - মাতা ললিতাদেবীর মন্দিরের পথে যাওয়ার উত্তরদিকে গড়রিয়া(মেষপালক) লোকেদের দ্বারা নির্মিত বলে ইহার নাম হয়েছে গড়রিয়া আশ্রম।

গোপাল মন্দির -আনুমানিক ১৯৬৪ সালে স্বামী গোপাল দাস এবং মধুসূদন দাসজী এই মন্দিরটি স্থাপনা করেন। নেপালী মন্দিরের দক্ষিণদিকে হনুমানগড়ী যাওয়ার পথে এই মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের সুন্দর বিগ্রহ আছে। দূর-দুরান্ত দেশের আগুন্তুক বৈষ্ণবদের থাকার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে।

চক্রতীর্থের উপরে অবস্থিত মন্দির সকল — চক্রতীর্থের পশ্চিমে নৈমিষনাথের মন্দির,উহার উত্তরদিকে গনেশ মন্দির(বিক্রমাদিত্যের দ্বারা স্থাপনা), ইহার উত্তর দিকে শিব মন্দির। এইটাকে এখানকার লোক পঞ্চমুখী ব্রহ্মাজির মন্দিরও বলে থাকে। তারপর বদ্রীনারায়ণ মন্দির, ইহার উত্তরে রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ইহার পূর্বদিকে ভগবান ভূতেশ্বরনাথ মন্দির - ইহা অতি প্রাচীন বলে কথিত আছে, এবং খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। আবার হনুমানজীর মন্দির, উহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে রামধাম। তারপর, - গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দির, উহার দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃক্ষের নীচে সরস্বতীর ছোট মন্দির, ইহার পশ্চিমদিকে সূর্য্যমন্দির - ইহা অহল্যাবাঈ স্থাপনা করেন। এখানে শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্রও বানানো হয়েছিল। এখানে শিবলিঙ্গও স্থাপনা করা হয়েছিল।

চন্দ্র ভগবান মন্দির -ললিতাদেবীর মন্দিরের দক্ষিণদিকে এই মন্দির অবস্থিত। ইহাকে উদাসীন বড় আখাড়া বলে সকলেই জানে, ১৯৬২ সালে স্থাপনা হয়।

জগন্নাথ মন্দির -প্রথমে জগন্নাথ মন্দির গোমতী নদী এবং চক্রতীর্থের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে উহা একটু দূরে পশ্চিমদিকে বানানো হয়েছে। এই মন্দিরের সংস্থাপক বাবা শ্রী নিবাসাচার্য্য বলেছেন যে, এ স্থানটি অতি

প্রাচীন ছিল । তিনি জগন্নাথদেবের সঙ্গে বেঙ্কটেশদেবের মন্দিরও স্থাপনা করেছেন । এই মন্দিরের উত্তরাধিকারী এখন শ্রী কমলানয়নাচার্য্য । ইহা দশাশ্বমেধঘাটের উত্তরে এবং নৃসিংহদেবের মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত ।

জানকীকুন্ড (বড় ছাউনী) -ইহা ললিতাদেবী মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত । এইটী অযোধ্যার বড় ছাউনীর একটি শাখা । এখানে রাম-সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । মন্দিরের সামনে হনুমানজীর মূর্ত্তি সেবকরূপে শোভা বর্দ্ধন করছে । প্রতিদিন এখানে ভজন-কীর্ত্তন হয়ে থাকে । এই স্থান অন্য স্থান থেকে জাগ্রত ।

টাটম্বরী আশ্রম - ইহা ললিতাদেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত । এই বাবা সর্বদা পাটের বস্ত্র পড়ে থাক্‌তেন জন্যই টাটম্বরী নামে পরিচিত ছিলেন । ইনি খুবই প্রসন্নচিত্ত ছিলেন ।

তোতাদ্রিমঠ -এটি (বেঙ্কটেশ মন্দির) রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠ । তাদের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বিশিষ্টা – দ্বৈতাদ্বৈত স্বামী অনন্তাচার্য্যের পরমশিষ্য স্বামী - কমলানয়নাচার্য্যজীর দ্বারা এই আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল । বিশেষভাবে নেপালী লোকেদের ধার্মিক চেতনার জায়গারূপে পরিগণিত হয় । প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে পুনঃস্থাপিত হয়, - কমলানয়নাচার্য্যজীর পরমশিষ্য দেবনায়কাচার্য্যের দ্বারা প্রগতির পথ প্রশস্ত হয় । শেষ ভেঙ্কটেশদেবের মূর্ত্তিটীতে বড়ই দিব্যভাব ফুটে উঠেছে । ইহার শাখামঠ-রূপে অযোধ্যা এবং নেপালের নারায়ণ ধারতে শাখারূপে আজও শোভা পাচ্ছে ।

ত্যাগী আশ্রম - ত্যাগী নামের প্রসিদ্ধ বাবা প্রেমদাসজীর দ্বারা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । এটি প্রায় ৪৫ বৎসরের প্রাচীন ।

দয়ালদাস মৌর্য্য আশ্রম -মৌর্য্য (মুরার) মহাত্মার দ্বারা স্থাপিত এই আশ্রম, প্রায় ৩০ বৎসরের প্রাচীন ।

নাগা আশ্রম -অর্জ্জুনশরণ নামক নাগা বাবার দ্বারা এই আশ্রম বিশেষভাবে নাগা সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত এই আশ্রম ।

<u>নরদানন্দ আশ্রম</u> -নৈমিষারণ্যতে যত আশ্রম আছে,তাদের মধ্যে এটি সবচেয়ে আয়তনে বড় ও আশ্রমবাসী হিসাবে বসবাসের সংখ্যা বেশী এবং খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। নৈমিষপীঠাধীশ্বর জগদাচার্য্য স্বামী নারদানন্দজীর তপস্যার পরিণামস্বরূপ এই আশ্রম বেড়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সৎসঙ্গের বক্তৃতা অনেকবার শুনেছি। তিনি কখনও ইটের ঘরে থাকতেন না। তাঁকে শেষ বয়সেও খেজুড় গাছের তলায়, ঝুপড়ী বা কুটীরে বাস করতে দেখেছি। আমাদের জন্য অট্টালিকা বানিয়ে, থাকার জন্য সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে আনন্দে থাকতেন। আশ্রমেতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা ছিল, তাঁর পরমশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের সময় ঐ আশ্রম সর্বদিকে বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করে। একান্ত বাসের জন্য গুহা ছিল, দেবপুরীতে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্ত্তি, হনুমানজীর মন্দির, ১০০৮টি শিবলিঙ্গ, ১০৮টি যজ্ঞক্ষেত্র, শৌনিক ও স্বর্ণকুটীর ও সমাধি মন্দিরটী দর্শনীয় স্থান। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত কৃষ্ণানন্দজী ওরফে ওঁবাবা এখানকার আশ্রমে দীর্ঘবৎসর স্বর্ণকুটীরে তপস্যারত ছিলেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আমার প্রিয়জনদের একজন ছিলেন।

<u>নির্ভরদাস আশ্রম</u> - এই আশ্রমের সংস্থাপক নির্ভরদাসজী। এনার আশ্রম হরিয়ানাতেও আছে। এটি বাস টার্মিনাসের উত্তরদিকে অবস্থিত। ১৯৭০ সালে এই আশ্রমটী তৈরী হয়েছে।

<u>পরমহংস আশ্রম</u> - স্বামী পরমহংসজী কর্ত্তৃক এই আশ্রমটী আনুমানিক ১৯৬৫ সালে তৈরী হয়েছিল, এই মন্দিরেতে রাম ও জানকীর মূর্ত্তিকে বহু নিষ্ঠার সাথে সকাল ও সন্ধ্যায় পূজা - ভোগ ও আরতি করা হয়।

<u>পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির</u> - পঞ্চপ্রয়াগের পূর্ব-উত্তর ভাগে এই আশ্রম। ইহাতে হনুমানজীর আনন্দ-কন্দ মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। এখানে বহু বৈষ্ণবগণ বাস করে থাকেন।

<u>প্রজাপতি আশ্রম</u> - এই আশ্রটী প্রজাপতি সাধুর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। ইহা ললিতাদেবী মন্দিরের পূর্বদিকে ১৯৮০ সালে স্থাপিত হয়।

<u>পুরাণ মন্দির</u> -নৈমিষারণ্যের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে এটী বিশেষ স্থান বলে আকর্ষিত। শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ীর ভক্তগণ দ্বারা ১৯৬৭ সালে স্থাপনা হয়,

হয়, বিশেষ আকর্ষকরূপে এই মন্দিরেতেই ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধু-সন্তদের উপস্থিতিতে, ৭ দিন ব্যাপী নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে "পুরাণ পুরুষ " স্থাপনা হয় । পর্য্যটক এবং দার্শনিকদের কাছে এই স্থানটী খুবই চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানের প্রতীকরূপে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ । এই মন্দিরেতে ১৮টি পুরাণ ও ৪টি বেদ সুরক্ষিত আছে । এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রতিদিন বিধিপূজা সকাল-সন্ধ্যায় আরতি করা হয় । উপরন্তু এক অখন্ড জ্যোতির্লিঙ্গ সংরক্ষিত হয়ে আছে, অদ্যাবধি দেখতে পাওয়া যায় । এই অখন্ড জ্যোতির্লিঙ্গ প্রায় ৩৫ বৎসরের প্রাচীন । এই জ্যোতির্লিঙ্গ ঢাকা হ'তে বারানসীতে নিয়ে আসা হয়, বারানসী থেকে নৈমিষারণ্যে নিয়ে আসা হয়েছে । ১৯৮০ সালে শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ী নিজ হস্তে শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করায়, এই আশ্রমের আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে । যেখানে শিব মন্দিরটী হয়েছে, সেখানে একটি বড় বেলগাছ ছিল, তা আমি নিজ চক্ষে দেখেছি ।

<u>বেদ মন্দির</u> - ১৯৭৩ সালে এখানকার মহন্ত বেদ-বেদাঙ্গ পাঠশালাটী স্থাপনা করেন । এই বেদ পাঠশালাতে নিয়মিত বেদ অধ্যয়ণ করা হয় ।

<u>বৈরাগীদাস আশ্রম</u> -প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাবা বৈরাগীদাস দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল । সাত্ত্বিকভাবে সর্ববিষয়ে জীবন ধারণই এখানকার লক্ষ্য বিষয় ।

<u>ভোলাবাবার আশ্রম</u> -ভোলাবাবা খুবই সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন । প্রথমে তিনি সীতাপুর থেকে নৈমিষারণ্যতেই বাস করছিলেন ।১৯৭৪ সালে তাঁর স্বর্গবাস হয় । তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বিদ্যাধরজী এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন ।আশ্রটী খুবই দর্শনীয় স্থান ।

<u>মনু ও শতরূপা</u> -ব্যাসগদ্দীর পূর্বদিকে উহাদের তপস্যাস্থল । মনুর নির্দ্দেশানুযায়ী মনু-সংহিতা রচিত হয়, ইহা মানবজাতীর সংবিধান বলা চলে । ইনিই বৈবস্বত মনু - মানবজাতীর বিভিন্ন সংস্কারাদি ও জীবনধারণের জন্য আদর্শ ও নীতি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন । এক-এক মন্বন্তরে এক একজন মনু এসেছিলেন, সুতরাং অনেক মনুর কথাই ইতিহাসে ও ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ পেয়ে থাকি ।

<u>মহাপ্রভুর বৈঠক</u> - বল্লভাচার্য্যজীর আগমন এই নৈমিষ ক্ষেত্রতে হয়েছিল ।

ইহার প্রথম ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও বৈঠক, ব্যাসগদ্দীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গোমতী নদীর তীরে হয়েছিল, সেজন্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্থান এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থানটী মহাপ্রভুর বৈঠক নামে প্রসিদ্ধ।

রামদাস আশ্রম(তুলসী বাড়ী) - তুলসীদাসজী রামচরিত মানস গ্রন্থটী এখানে বসে লিখেছিলেন তা ঐ গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে। চিত্রকূট হ'তে এই রামচরিতমানস গ্রন্থটী লেখা শুরু হয়, তারপড় শিবক্ষেত্র বারাণসীতে শিব বিষয়ক, এরপর অযোধ্যাতে ও সর্বশেষে এই পবিত্রভূমি নৈমিষারণ্যতে লেখা শেষ করেন বলেই অনুমান করা হয়। এর সাক্ষীস্বরূপ বহু কথাই ঐ গ্রন্থে (রামচরিত-মানস) লেখা আছে।

রাম-শবরী মন্দির -এখানকার মহন্ত ছিলেন চেতনদাসজী ও শংকরদাসজী। এটী বৈষ্ণবাশ্রম বলেই কথিত। এস্থানটী খুবই জাগ্রত ও পবিত্র। প্রায়শঃই এখানে বিভিন্ন কার্য্যক্রম চলতে থাকে। শবরী ভোলনীর মন্দির, তিনি ভগবান রামচন্দ্রের চরণে সবকিছু সমর্পণ করেছিলেন। এর নিকটেই পঞ্চমূখী শিবের মন্দির। আনুমানিক ১৯৫০ সালে এই মন্দিরটী স্থাপিত হয়েছিল, মুখ্যতঃ কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য এই আশ্রমটী স্থাপিত হয়েছিল।

লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির - দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই লক্ষ্মী-নারায়ণ নামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বারা এই মন্দিরটী নির্মিত হয়েছিল। ইনি দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তিনি সোনা বানানোর পদ্ধতি জানতেন বলে প্রচলিত ছিল, তাঁর শিষ্য মধুসূদনাচার্য্য - বৈদ্যরাজ। সাধনার অঙ্গ হিসাবে প্রতিদিন কীর্ত্তন ও ভক্তিমূলক গান-বাজনা হতো। পাশেই দুইটী মন্দির – একটি নাগেশ্বর মহাদেবের অপরটী শ্রীরামের। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র এখানেই দশ-অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই মন্দিরটীও অতি প্রাচীন বলা চলে।

হরিহরানন্দাশ্রম(ব্রহ্মবিজ্ঞান পীঠ) - স্বামী ১০৮ হরিহরানন্দজী এই আশ্রম ১৯৭০ সালে স্থাপনা করেন। এই আশ্রমকে ব্রহ্মবিজ্ঞানপীঠ নামেও জানা যায়। স্বামীজী বেদান্ত বিষয়ে এবং জ্ঞানচর্চায় পারদর্শী ছিলেন।

সন্তদাস আশ্রম - এই আশ্রমের সংস্থাপক ও সংরক্ষক স্বামী সন্তদাসজী খুবই সৎ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন ।

সাবিত্রী আশ্রম - সাবিত্রী নামক একজন ব্রহ্মচারিণী মাতা ছিলেন, তিনিই এই আশ্রম স্থাপনা করেন ।

সিতারী বাবার আশ্রম - এই আশ্রমটী প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছিল, ইহার মুখ্য সংরক্ষকের নাম ছিল - দুর্গাদাসজী মহারাজ । খুব শান্ত পরিবেশে এই আশ্রমটী ভক্তজনকে আনন্দ ও শান্তি প্রদান করতো ।

সিদ্ধেশ্বর মহাদেব - এই মন্দিরের বয়স প্রায় ৩৫০ বৎসরেরও বেশী । চক্রতীর্থের দক্ষিণদিকে নালার পাশে অবস্থিত । এখানকার শিবলিঙ্গটী অন্যান্য শিবলিঙ্গ থেকে বড় ও সুন্দর । কথিত আছে – নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এখানে প্রায় ১০ বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সেজন্য এ আশ্রমের নামাকরণ হয়েছে সুভাষ চন্দ্র বোসের নামানুসারে । তখন শিবনারায়ণ রাজারাম দীক্ষিত ঐ সময়ে এখানকার সংরক্ষক ছিলেন ।

সূত গদ্দী - শ্রীমৎ ভাগবদ্ পুরাণ পাঠক সূতজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে চক্রতীর্থের পূর্বদিকে এই স্থানটী তৈরী হয়েছে । এই স্থানটী অতি প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । গুজরমল মোদীজি এই মন্দিরটী নূতনরূপে সংস্কার করান । এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৈরী একটি বড় শিবমন্দির আছে ।

নৈমিষারণ্যের ধর্মশালাগুলি।

প্রাচীনকালে শুধু তীর্থগুরু পান্ডাদের ঘরে থেকেই তীর্থাদি, মন্দিরাদি প্রভৃতিতে দর্শন করা হতো । পরবর্ত্তীতে বড় বড় ব্যাবসায়ী ও ধনীব্যক্তিরা তীর্থযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য ধর্মশালা বানিয়েছেন ।

১)<u>মোদী ভবন</u> - মাতা আনন্দময়ীর প্রেরণায় - গুজরমল মোদী ১৯৭৭ সালে, খুব জাঁক-জমক ও সাজ-সজ্জা সমেত একটি অতিথি ভবন বানিয়েছেন। এখানের অতিথি ভবনটি ৬ কামরা বিশিষ্ট। কেদারনাথ মোদী ইহার প্রধান সংরক্ষক।

২)<u>মাঘীপ্রসাদ বিট্ঠদাস ধর্মশালা</u> - লক্ষ্ণৌ ধর্মশালা নামে এই ধর্মশালাটি বহুল প্রচারিত, কারণ লক্ষ্ণৌ-এর রস্তোগী পরিবার দ্বারা এই ধর্মশালাটি পরিচালিত। ১১ কামরা বিশিষ্ট এই ধর্মশালায় জল ও বিদ্যুতের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩)<u>বালমুকুন্দ ধর্মশালা</u> - এই ধর্মশালাটি স্বামী বালমুকুন্দজীর প্রেরণায়, বাঁগড়(কোলকাতা)-এর দ্বারা বানানো হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে। হনুমান-গড়ী যাওয়ার পথের বাঁদিকে অবস্থিত।

৪)<u>বারাবংকী ধর্মশালা</u> - বারাবংকীর একজন ধনশালী ব্যক্তি এটা বানিয়েছেন। রামানুজ কোট থেকে চক্রতীর্থে সড়কের ডানদিকে স্থিত।

৫)<u>পঞ্চায়েত ধর্মশালা</u> - কোলকাতার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সৌজন্যে এই ধর্মশালা প্রস্তুত হয়েছে। খুবই বড় ধর্মশালা।

৬)<u>কোলকাতা ধর্মশালা</u> - চক্রতীর্থ থেকে ললিতাদেবীর মন্দিরে যাওয়ার পথে ডানদিকে অবস্থিত এই ধর্মশালাটী দেখতে অনেকটা পুরানো আমলের মতো।

তাছাড়াও গৌড়ীয় মঠের ধর্মশালা, অহল্যাবাঈ, ইউ.পি.গভঃ ট্যুরিষ্ট লজ্ প্রভৃতিতে থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

ॐ যোগসিদ্ধি। ॐ

যেমন এক অচিন্ত্যমহাশক্তির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি অর্থাৎ এক হতে দুই, দুই হতে বহু, তেমনি দুই-এ মিলে এক হয়ে যাওয়া। পরমশিব +পরমাপ্রকৃতি = এক অচিন্ত্যমহাশক্তি = আনন্দ = যোগশক্তি = অখন্ডমহাযোগ।

প্রারব্ধ ক্ষয় হয় শুধু যোগসিদ্ধির দ্বারা ,অচিন্ত্যমহাশক্তির ইচ্ছার সাথে জীবের ইচ্ছা এক হলে - ইচ্ছাশক্তি +জ্ঞানশক্তি +ক্রিয়াশক্তি। হরিদ্বার, এলাহাবাদ(প্রয়াগ) উজ্জয়িনী ও নাসিক এই চার স্থানে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর একবার পূর্ণকুম্ভ বা মহাকুম্ভ হয়। তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু সংখ্যক মহাপুরুষ বা যোগসিদ্ধ পুরুষের আর্বিভাব বা সমাগম হয়। সেই সমস্ত মহাপুরুষের প্রভাবে সূর্য্যকিরণের মত সর্বদা বিশ্বের কল্যাণে জ্যোতির স্রোত সাধারণ তীর্থ-যাত্রীদের উজ্জীবিত বা প্রভাবিত করে, কিন্তু বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে পারলেই পূর্ণকুম্ভতে তীর্থে আসার সার্থকতা সহজে অনুভব বা আস্বাদন করতে পারা যায়।

ঐ যে অনুভব বা আস্বাদন তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বা সাধনা,কাউকেও বাক্যের দ্বারা শত শব্দ বক্তৃতার মাধ্যমে বা সহস্রাধিক বই লেখার দ্বারাও ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই একে স্ব-প্রকাশ বলা হয় অর্থাৎ তার অনুভব ও আস্বাদন সম্পুর্নই নিজস্ব। যোগসিদ্ধি ও প্রারব্ধক্ষয় দুই-ই ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়।কোন কসরত বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। জীবের ইচ্ছার সাথে ভগবানের ইচ্ছা মিশে গেলেই, অনুভব বা আস্বাদন অতি সহজেই হয়। জীবনমুক্ত পুরুষ বা আধিকারিক পুরুষ, ঈশ্বরকোটি বলে ঈশ্বরেচ্ছায় অপরকেও মুক্ত করবার শক্তি পান। সাক্ষী ও দ্রষ্টারূপে থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁরই ইচ্ছা। ঈশ্বরানুভব ছাড়া কর্মবন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

-ঃ শিবত্ব লাভ কাকে বলে, কিরূপে হয়? ঃ-

তুমি নিজেই শিব ও শক্তি এটা তুমি ভূলে গেছ, এই ভূলটা প্রারব্ধের ফলে বা পূর্বজন্মের কর্মফলে(প্রারব্ধফলে)। এই প্রারব্ধ,শুদ্ধকর্ম বা নিঃস্বার্থফলে যখন কমে আসবে বা ক্ষীণ হবে তখনই জ্ঞানের উন্মেষ হবে, ধীরে ধীরে

সৃষ্টিস্থিতির জ্ঞান, পরোক্ষ-অপরোক্ষ জ্ঞান হবে। এই জ্ঞান তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি কে ? তুমি কি ? পঞ্চভূতের জ্ঞান, চিত্তের চিত্তাকাশের জ্ঞান, এটাকেই বলে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ তুমি দেহ নও, তুমি ইন্দ্রিয়াদি নও,"অবাঙ-মানসগোচর" বাক্য মনের অতীত অর্থাৎ বাক্য মনের দ্বারা ধরা যায় না, বোঝানো যায় না এমন ।শুধু অনুভব,সৎসঙ্গ,গুরুবাক্য, প্রেম,অপরোক্ষ দর্শন বা প্রত্যাভিজ্ঞার মাধ্যমে। ভগবান বা ঈশ্বর বা গুরু কোথায় নেই, সর্বত্র বিদ্যমান সুতরাং আমার অন্তরস্থলে, হৃদয়-গুহাতে (ষট্চক্র বা কুন্ডলিনীই আত্মা)। সেজন্য আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। লক্ষ লক্ষ বই পড়ে শত শত উপদেশ,জন্ম জন্মে উপবাসে থাকলেও আত্মজ্ঞান হবে না। বহিঃমুখী হতে ইন্দ্রিয়াদিকে শুদ্ধ করলে, ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হয়ে নিজের ভিতর হতেই ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞান হবে। তখন আত্মাই আত্মাকে বরণ করে নেবে,অর্থাৎ কামনা-বাসনার জন্য পশুপতি বা পশুভাব নিয়ে লীলা করছে নানা-রূপে,নানা-বেশে। সেই যখন ঐ পশুপতি, নিজের ভিতর হতে নিজে-নিজেই পশুভাব দূর করে পশুপতি বা শিব, দিব্যভাবে বা চৈতন্য হয়ে ঐ পশুভাব ও পশুপতি দুইভাব(বিসর্গতত্ত্ব) ছেড়ে দিয়ে একভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই পরমাত্মভাব, এক বা অখন্ডভাব (একং নিতং)।

লীলা করার সময় দুই-রূপ, দুই-দেহ থাকতেই হবে, প্রেমের ভিতরও দুই-দেহ বা দুই-রূপ থাকতেই হবে তাছাড়া লীলা হবে না, এটাই হচ্ছে পঞ্চ-রসের (দাস্য,সখ্য,বাৎসল্য,মধুর ও শান্ত) ভিতর মধুর রস। এই মধুর রসে চঞ্চলতা ও শান্তরস দুই-ই থাকবে। রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিব-শক্তি, সদাশিব-মহাশক্তি, পরমশিব-পরমাপ্রকৃতি এক পরমাত্মাই দুই সেজে লীলা করছে। একে-তে আস্বাদন হয় না তাই আস্বাদনের জন্য দুই-দেহ দুই-রূপ অবশ্যই হওয়া চাই। এক পরামাত্মাই - দুই দেহ, দুই রূপ সেঁজেছেন আবরণ ও মল দিয়ে। এক সোনা থেকেই –গলার হার,হাতের চুরি,কানের দুল আরও অনেক কিছুই হয়,বিভিন্ন বিভিন্ন নামে ও রূপে, বিভিন্ন দেহে। কিন্তু সোনাই মূল উপাদান বা পরমাত্মা এক থেকেই বহু দেহ,রূপ ও গুণে। ঐ অলংকার গুলিকে সোনার দোকানে গলালে গয়নার আকার যেমন থাকে না, তেমনি গয়নার নামও থাকে না, একমাত্র গোলাকৃতি সোনাই থাকে। সেইমত মানুষ নিজের ভিতর থেকে আচার-ব্যবহারে,বাক্যতে,আচরণে,প্রভৃতিতে পশুভাব দূর করতে পারলে সেই-ই পশুপতি হবে অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হবে,শিব হচ্ছে শান্ত,কল্যাণ ও মঙ্গলদায়ক।

৯৩ সূর্য্য বা সৌরী সাধনা। ৫২

ভারতবর্ষে সাধনার ধারা বা প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হলেও, -সাধনার ৫টি ধারার ভিতরেই সকল ধারার গুপ্তরূপ বা ঐতিহ্য দেখা যায়, যেমন - গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌরী সূর্য্য ।

সবিতা,সাবিত্রী বা সূর্য্য একই কথা বা শব্দ । সবিতার মূল অর্থ হলো – "যিনি প্রেরিত করেন বা প্রচোদিত করেন ", প্রসব করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করেন, এবং সংহার বা সংবরন করেন ।

সৌরী বা সবিতার উপাসনা ভৌতিক সূর্য্য থেকেই এসেছে । আমাদের উপনয়নের সময় যে মন্ত্র বিশেষভাবে পাই,তাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয় এবং যে ছন্দতে -উচ্চারিত হয় তাকে গায়িত্রী ছন্দ বলা হয় । সাবিত্রী মন্ত্র অর্থাৎ সূর্য্যেরই উপাসনা । ভৌতিক সূর্য্যকে দেখে, আমরা উদ্দীপনা অনুভব করি । উদ্দীপনা প্রবল হলে একই সৎ আধিভৌতিক সূর্য্য, অন্তরে অধ্যাত্মিক সূর্য্য এবং অধিদৈবত সূর্য্য । আমাদের ভাবনা যখন আরও গাঢ় হয়, তখন তিন সূর্য্যকে আর কখনও পৃথক কল্পনা করতে পারিনা, একেরই প্রকাশ বলে মনে হয় -"একং নিতং" বলে বিশ্বাস করি । এমনকি চিন্ময় বলে সমস্তকেই ধরে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের ঈশ্বর বা ভগবান হচ্ছে - "সূর্য্য " । তাঁর মতো মহিমা ও করুণা জগতের কারও নেই, তাই সূর্য্যই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বা ভগবান । ভৌতিক সূর্য্য ভৌতিক নয়, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনিই আত্মা, দেবতার দৃষ্টিতে তিনিই - ব্রহ্ম । বেদ ও বেদান্তে সূর্য্য সম্বন্ধীয় লেখা আছে —

" বিশ্বানি দেব সর্বিতুর দুরতানি পরাসুব ,
যদ্ ভদ্রং তন্নো আসুব " ।

এর অর্থ এই যে - হে সূর্য্যদেব, হে বিশ্বের দেবতা, তোমার অশুদ্ধ শক্তি শুদ্ধপ্রাপ্ত হোক এবং তোমার বরেণ্য জ্যোতি আমাদের ভিতর প্রবেশ করুক -

৵ সংসার। ৻

সংসার ২টীই প্রধান । প্রথমটী - স্ত্রী, স্বামী, ভাই-বোন এবং অন্যান্য অনিত্য(প্রাকৃত) আত্মীয় স্বজন নিয়ে ।

দ্বিতীয়টী - পারমার্থিক,পরমাত্মাকে নিয়ে । নিত্য(অপ্রাকৃত) আধ্যাত্মিক । এরা কারা, কে পাঠিয়েছেন, এদের প্রারব্ধ, সঞ্চিত কর্ম এবং ক্রিয়ামান কর্ম কি ?

প্রারব্ধকর্ম – ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর, সৌভাগ্যবশতঃ মানবদেহ লাভ করেছি, কিন্তু মানবদেহ লাভ করলেও আমাদের প্রকৃতিতে অল্পবিস্তর পশু ভাব থাকে । এমনকি, মনোময় কোষের প্রকাশ যখন ধীরে ধীরে চলতে থাকে তখন শুদ্ধ, শুদ্ধতর, শুদ্ধতম অবস্থায় পৌছেও পতন ঘটতে পারে অর্থাৎ ভগবৎ জীবন লাভ করেও স্খলন হতে পারে ।

আমাদের প্রকৃতি অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন চলার পর অন্তঃপ্রকৃতির জাগরণ বা অন্তঃমুখী হওয়াতে ক্রমশঃ বোঝা যায় আমি এতো দিন কিছুই করিনি, করতেও পারি না ।

ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হলে ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, শাস্ত্র ও গুরুর আদেশানুসারে চলার পর অনেকটাই অনুভবে আসে । অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা সব কর্মই হয়ে চলেছে । তিনটী গুণ ও প্রকৃতি বা স্বভাবের মাধ্যমে অচিন্ত্যমহাশক্তির দ্বারাই বাহির ও ভিতর চালিত হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তঃআত্মা । আত্মা - নিত্য,শুদ্ধ,বুদ্ধ,মুক্ত । আত্মাই সব । আত্মাই একমাত্র নিত্য আর সবই অনিত্য । আমরা চর্মচক্ষুতে (পার্থিবচক্ষু) যা দেখি সবই পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরীত এতে কোনও সন্দেহ নেই, সুতরাং আত্মাই একমাত্র সৎস্বরূপ । স্বরূপ দর্শনই আত্মদর্শন, শুধু আত্মদর্শনই শেষ কথা নয়, ক্রমে ক্রমে আত্মদর্শন, আত্মস্থিতি, আত্মশক্তির জাগরণ হলেই সত্যদর্শন ও সত্যস্থিতি হয় । সত্যশক্তির দ্বারাই সৃষ্টি,স্থিতি ও লয় কার্য্য হয় । তাই,সত্যপ্রতিষ্ঠা,আত্মপ্রতিষ্ঠা ও পরিশেষে আনন্দ প্রতিষ্ঠাই আমাদের সকলের কাম্য ।

গীতাতে – " আত্ম সংস্থং মন কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ "
প্রাণবায়ু বা আত্মা প্রকারান্তকারে একই ।

পরমাত্মার দ্বারাই ভাল-মন্দ, নিত্য-অনিত্য, মায়া-মুক্ত, মোক্ষ বা আস্বাদন সব কিছুই হয় । তাই পরমাত্মা সর্ব কারণের কারণ, --তিনিই একমাত্র কর্ত্তা । আমাদের কোন শক্তি, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য-ই নেই । আমরা নিজেরা শুধুমাত্র অজ্ঞানতার জন্য নিজেকে কর্ত্তা ভেবে,অভিমান করে দুঃখ-কষ্ট পাই । প্রকৃত জ্ঞান হয় যে তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে, সেটাও পরমাত্মারই দেওয়া জ্ঞান । জ্ঞান-অজ্ঞান তারই দেওয়া । শুভা-শুভ, মায়া-মোহ, মুক্ত-মোক্ষ তার দ্বারাই, আবার তার দ্বারাই দিব্যজীবন লাভ তারপর চৈতন্য, পূর্ণত্ব বা অখন্ডত্ব লাভ । তিনিই একমাত্র নিরপেক্ষ । আমাদের সর্ববস্থাতে তার শরণাগতিই – একমাত্র পথ ।

কর্ম বনাম জ্ঞান।

তর্কে সর্বত্রই শোনা যায় কর্ম বড় না জ্ঞান বড় ? নিত্য-অনিত্যে, কালো-আলোতে যে পার্থক্য, কর্ম আর জ্ঞানেতে ঠিক সেই রকমের পার্থক্য । কর্ম্ম হচ্ছে - মনের অধীন, আর জ্ঞান - মনের অধীন নয়, কিন্তু বস্তুর অধীন । কর্ম্মকে ইচ্ছা করলে মন তৎক্ষনাৎ ত্যাগ করতে পারে । কিন্তু জ্ঞান একবার হলে, মন কিছুতেই তাকে ত্যাগ করতে পারে না ।

আমি যেমন সাইকেল চালাচ্ছি, মন ইচ্ছা করলে বন্ধ করে দিতে পারে । সাঁতারের অভ্যাস বা জ্ঞান একবার হলে, মন তা কখনই ত্যাগ করতে পারে না । কেউ যদি বলে যে - (মন)"তুমি সাতার ভুলে যাও, নইলে তোমাকে প্রাণ দন্ড দেব" মন হাজার চেষ্টা করলেও আমৃত্যু সাঁতার ভূলে যাওয়া সম্ভব হবে না ।

সেইমত একবার আত্মজ্ঞান হলে কখনই তা ভোলা যায় না বা মুছে যায় না অর্থাৎ মন কখনও তাকে ত্যাগ করতে পারে না, একমাত্র আত্মজ্ঞান হলেই মনের সকল প্রকার অজ্ঞানতা, মলিনতা দূর হয়ে গিয়ে পরমানন্দ লাভ হয় । এটি নিশ্চয়াত্মক ও নিঃসন্দেহ, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই । দেহের মধ্যে ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫টি কর্মেন্দ্রিয়ের নাম দেওয়া হয়েছে । শুধু দশেন্দ্রিয় উল্লেখ করা যেত, কিন্তু সকলেই বুঝতে পারবে যে,কর্মানুসারেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদির নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন - চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি দ্বারা মন

তপোভূমি-৬

যা গ্রহণ করে তারই নাম - জ্ঞান। সেজন্য এ পাঁচটীর নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞানেন্দ্রিয়। সেরূপ কর্মেন্দ্রিয় ৫টির দ্বারা মন যে কাজ করে তারই নাম কর্ম। কর্মই আমাদের কামনা - বাসনা বৃদ্ধির মূল কারণ আর জ্ঞান হচ্ছে, মুক্তি-মোক্ষ এবং নিজেকে জানা অর্থাৎ আত্মাকে জানার একমাত্র কারণ। কর্মীর মুক্তি-মোক্ষ অনেক দূর থেকে যায়,কর্মে লিপ্ত থাকলে বার বার সংসারে এসে সংসার যাতনা ও ত্রিতাপ সহ্য করতে হবেই হবে। কিন্তু, একমাত্র যোগস্থ কর্মই কর্ম (নিঃস্বার্থ কর্ম)।

কর্মের প্রকার ভেদ।

কর্ম তিন প্রকারের হয়। <u>সকাম-কর্ম</u> —সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কর্ম, কামনা-বাসনা যুক্ত ফলের আশায় স্বর্গ সুখের যে কর্ম এবং নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম ব্রত-পূজাদি সকাম-কর্ম।

<u>নিঃস্বার্থ কর্ম</u> – যে কর্ম নিজের সুখ-শান্তির জন্য লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র অন্যের উপকারার্থে অর্থাৎ দেশের ও দশের জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে নিঃস্বার্থ কর্ম বলে। আমার দ্বারা অপরের উপকার হলো এটাতে কিন্তু কামনা থেকে যায় তাই এটা নিঃস্বার্থ কর্ম হলো না।

<u>নিষ্কাম কর্ম</u> – অনেকেই নিঃস্বার্থ কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলে থাকে, মনের সর্বশেষ অবস্থায় অর্থাৎ মন যখন আত্মজ্ঞান লাভ করে, পুরোপুরি ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে যায়,নিজেকে-অন্যকে পৃথক ভাবে না দেখে উপকার-অপকারাদি সর্ববিষয়ে নিষ্কাম হয় অর্থাৎ কামনাহীন মন যা কিছু করে – সেটাই নিষ্কাম কর্ম। মন যখন নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কর্মে অনুরক্ত নয়, কর্ম ত্যাগ করার জন্য ব্যস্ততাও থাকেনা, তখন কর্মের-ফল অনুসন্ধানের দিকে লক্ষ্য থাকে না। যে কোন সাধনার(প্রথম থেকে শেষ অবধি) আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই সবকিছু। সুতরাং যে - যে কর্ম আত্মজ্ঞানের সহায়ক তা অগ্রগণ্য ও একমাত্র গ্রহণীয় নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম ও নিঃস্বার্থ কর্ম-তে অল্প বিস্তর দুঃখ-শোক-তাপ ও বন্ধন জন্মাবেই। আত্মার আরাধনার্থ কর্ম্মই শোক-তাপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয় আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে। নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে - একমাত্র কর্ত্তৃত্ব, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে নিষ্কাম কর্ম করা।

৩ কর্ম বড় না জ্ঞান বড় ? ৫

সাধারণ লোকের অজ্ঞান বা ক্ষুদ্র মন নিয়ে আত্মজ্ঞানীর মনের অবস্থা ধারণা করা অসাধ্য বা কঠিন। জাগতিক কর্মসকলের নিস্ফলতা বুঝতে পেরে যোগী বা আত্মজ্ঞানী বা সত্যদর্শন করার জন্য উন্মুক্ত ব্যক্তি, বৈষয়িক কর্ম ত্যাগ করেন কারণ – আত্মদর্শন,আত্মস্থিতি,আত্মলাভ করেও ব্যবহারিক জগতের আহার-নিদ্রা, চলা-ফেরা, পরস্পর বাক্যালাপাদি করবার সময় নিস্কাম, নির্লিপ্ত ভাবে থেকেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁদের কাছে কেউ উপদেশ প্রার্থী হলেও পরোপকারের জন্য নিস্কাম ভাবেই তারা উপদেশ দিয়ে থাকেন।

এমনকি,তাদের অহংবুদ্ধিশুন্য মন,আগ্রহ নিগ্রহহীন হয়ে পূর্ব্বসংস্কার বসে (প্রারব্ধ) অতি সংক্ষেপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করার উপযোগী আহারাদি,সামান্য কার্য্যও করে থাকে মাত্র। তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত থাকলেও না থাকার ন্যায় হয়ে যায়। এজন্য তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত(মন) "চিত্ত"রূপে পরিগণিত না হয়ে "সত্ত্ব"রূপে পরিগণিত হয়।

সৎ-অসৎ বিচারশক্তির দ্বারাই আত্মজ্ঞান জন্মে থাকে। বুদ্ধি ও বিবেক একই মনে হলেও কিছুটা ভেদ আছে। বুদ্ধি হচ্ছে বর্হির্মুখী বৃত্তি, আর বিবেক অন্তঃমূখী বৃত্তি। বুদ্ধি পরোক্ষ জ্ঞান, বিবেক অপরোক্ষ জ্ঞান। বুদ্ধি বর্হিজ্জগতের জ্ঞান ধারণ করে এবং বিবেক অন্তঃজগতের আত্মানুসন্ধান করে। বিবেক থেকেই বিচার শক্তি জন্মে। সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, কোনটা প্রেয় আর কোনটা শ্রেয় এভাবে পৃথক করবার যে শক্তি,তারই নাম বিবেক।

কর্ম বিবেকের কারণ নয় বরং কর্ম বিবেকের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। সাধু-সন্ত সঙ্গলাভ ও সৎগ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা বিবেক শক্তি জন্মে। কেবল লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থ মুখস্থ করে পান্ডিত্য লাভ করলে বা শত-সহস্রবার মালা জপলে অথবা পূজাদি ও যজ্ঞ করলেও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

আত্মা,পরমাত্মা,ভগবান,ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একই শক্তি,মাধুর্য্য,ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি – মানুষের মধ্যেই প্রকটীত হয়। প্রত্যেকের মানুষের মধ্যেই ভগবানের আর্বিভাব ঘটে তাঁর নিজ আধার অনুযায়ী। ভূতশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি সর্বপ্রথম তারপর অন্যান্য

তারপর অন্যান্য শুদ্ধিকরণ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায় । নিজের ভিতরেই প্রকাশ, মহাপ্রকাশ, পরমপ্রকাশ হতে থাকে । নিজের প্রকাশই পুনঃরায় নূতনভাবে প্রকাশিত হয় ।

আত্মাই " এক " -- আমার আত্মাই,সকলের আত্মা, একই আত্মা ।

মন।

মনের তত্ত্ব খুবই জটিল, এই তত্ত্ব বুঝতে হলে,আমাদের শুধু ব্যবহারিক বুদ্ধি হলেই চলবে না । নিজের মনের দিকে,বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে -- সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, ভাল-মন্দ, আসক্ত-অনাসক্ত প্রভৃতির । স্বাধীন শুভ চিন্তায় মগ্ন(তৈলধারাবৎ) হয়ে,গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও নিজের অনুভব(অনুমান নয়) শক্তি বলে নিজের ভিতর একাগ্রভাবে স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন(তৈলবৎ ধারা) করলে অচিন্ত্য মহাশক্তির জাগরণ হবেই হবে ।

এই মনকেই(চিত্ত শুদ্ধি) শক্তি, মায়া, প্রকৃতি, জগজ্জননী, অজ্ঞান, অবিদ্যা, হৃদয় ইত্যাদি বলা হয় । ম্যাজিক বা ভোজ-বাজীর এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে, বস্তুর কোনই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না অথচ সেই বস্তু সত্য-সত্যই আছে বলে প্রত্যক্ষ হয় । এই মনঃশক্তিও ঠিক সেইরূপ । এই মনঃশক্তির সমষ্টির নামই "মায়া "। এই "মন "আর "মায়া " একই বস্তু । ক্ষুদ্র ও ব্যাপক এই মাত্র প্রভেদ । ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনের সমষ্টিকেই মায়া বলা হয় । যেমন কলা গাছ আর কলা বাগান । কলা গাছ বললে পৃথক পৃথক এক একটি ব্যষ্টিরূপে বোঝায় আর কলা বাগান বললে সমস্ত কলাগাছগুলিকে সমষ্টিরূপে বোঝায় ।

সুতরাং বুঝতে হবে যে, মনের বাগানের নামই মায়া আর এই মন ও মায়ার কার্য্যকলাপ ঠিক একই রকম, নেই বস্তুকে আছে বলে দেখান বা মিথ্যাকে সত্যি বলে দেখা যায় । অর্থাৎ ভ্রম প্রদর্শন করানই মনের স্বভাব বা শক্তি । এইরূপ মনের সমস্ত কার্য্যই যে আশ্চর্য্যকর, তা আরও পরে বুঝতে পারা যায় । এখন নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে । সত্যিই মন আছে তো ?

তোমার মনটি কতটা লম্বা ? দুই হাত ? দশ হাত ? নাকি দশ মাইল ? এবং আকার কিরূপ ? গোলাকার ? চতুষ্কোণ ? নাকি চেপ্টা ? ওটা মানুষের আকার,

কি পশুপক্ষীর আকার না বৃক্ষের আকার, না বাড়ীর আকার ? এই ভাবে কোন আকার প্রকার বলতে পারা যায় কি ?

আমাদের মনটি স্ত্রীজাতি কি পুরুষ জাতি তা বলতে পারা যায় কি ? মনটি কালো না সাদা, লাল না নীল ইত্যাদি কোন বিশেষ রং মনের আছে কি ?

মন কোন্ বস্তু পেলে সুখী হয় আর কোন্ বস্তু পেলে দুঃখী হয় তা বলা যায় না। মনের কোন আকার প্রকার নেই, নিরাকারও নয়। নিরাকার হলে দেহের মধ্যে আছে কি প্রকারে ? আমাদের দেহ স্থূল ও সাকার, তাই মনের কোন আকার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এযে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। মন আছে অথচ স্ত্রীজাতি কি পুরুষ জাতি তাও বোঝা যায় না। কাজেই এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে। আমরা বলি যে, মন বহুরূপী অথচ লাল কালো কোন নেই,মন রূপহীন। কিন্তু রূপহীন কোন বস্তুই জগতে নেই, সুতরাং বিশেষ আশ্চর্য্যকর। মনের সুখ-দুঃখের কোন নির্দিষ্ট বস্তু নেই। তাহলে সেই মনের কোন স্থিরতা নেই - সেজন্য মন অস্থির। কিন্তু জগতের সকল বস্তুরই কম-বেশী একটু না একটু স্থিরতা নিশ্চয়ই থাকে। মনের আকার রূপ, গুণ, জাতি প্রভৃতি কিছুই নেই, তবে এমন যে মন আমাদের মধ্যে আছে তা কি প্রকারে বিশ্বাস করি ?

সকলেই চক্ষু দ্বারা জগতকে দেখতে পারে, কিন্তু নিজের চক্ষুকে দেখতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ মন দ্বারা ব্রহ্মান্ড দেখতে পাও বটে, কিন্তু মনকে দেখতে পাও না বা মন সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারা যায় না - এটি একটি আশ্চর্য্যের ব্যাপার। যে দিন নিজে নিজের মনকে দেখতে পাব, অর্থাৎ মনের হাত, পা, চক্ষু, কর্নাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত উপলব্ধি করতে পারবো, সেইদিনই আমার মন আমাকে সাথে নিয়ে গিয়ে পরমাত্মার সন্মুখে পৌছিয়ে তাঁর সাথে একাকার করে দেবে। কিন্তু কায়-মন-বাক্যে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ মনকে ধরবার জন্য চেষ্টা যদি করিও তবেও মনকে ধরা যাবে না কারণ, মনের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই মন বর্ননাতীত। যার সৃষ্টি আছে তার ধ্বংস বা পরিবর্তন বা রূপান্তর হবেই হবে। যা কিছু চোখে দেখা যায়, সে সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ পরিবর্তন বা রূপান্তর সাপেক্ষ অর্থাৎ অনিত্য। কিন্তু, পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য, বাকি সবই অনিত্য। তত্ত্ব জ্ঞানের পর একমাত্র পরমাত্মারই অস্তিত্ব থাকে আর

কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে। প্রথমার্দ্ধে মন ইন্দ্রিয়াদিকে চালনা করে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধিই মনকে চালনা করে।

এই যে স্বচ্ছ আকাশের নীলবর্ণ সকলেরই দৃষ্টি গোচর হয়,এর উৎপত্তি বা বিনাশ সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিকই নীরব। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতান্তরও ঘটেছে কিন্তু আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলেই নীরব ও নির্বাক। কেননা আকাশতত্ত্ব খুবই রহস্যময়।

আকাশের রং নীল নয়, নীল দেখাটা অজ্ঞানতা, এই মিথ্যা নীলিমা অনন্ত-অনাদি কাল যাবৎ দেখা যাচ্ছে ও দেখা যাবে। এর কোনই অস্তিত্ব নেই, তবু আছে প্রকাশ পেয়ে আসছে। ঠিক এইরূপ জীবনের মায়া অর্থাৎ মনের উৎপত্তি ও বিকাশ নেই, তবু মন অনাদি কাল হতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকবে। এই মায়া আকাশের নীলিমাবৎ মূলে মিথ্যা কিন্তু সত্যের মত ভূল জন্মাতে সক্ষম। যেমন আকাশ স্বচ্ছ হয়েও অস্তিত্বহীন নীলবর্ণের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে, এবং অনাদি কাল হতে আকাশ লোকচক্ষের অন্তরালে থেকেও নীল বর্ণ দৃষ্ট হচ্ছে। ঠিক সেইরূপ নির্দ্দোষ আত্মাও অনাদি কাল হতে মিথ্যা মনরূপ মায়া দ্বারা আবৃত হয়ে, অনন্তকাল জগতের জীবের দেখায় বর্হিভূত হয়ে রয়েছে।

আরও দেখা যায় যে, আকাশ নীলবর্ণ দেখা গেলেও তা যেমন কখনও নীল বর্ণ প্রাপ্ত বা লিপ্ত হতে পারে না, যত উর্দ্ধে ওঠা যাবে, ততই তার স্বচ্ছতা প্রকাশ পাবে। সেইরূপ নির্দ্দোষ পরমাত্মা সর্ব্বদা লোকচক্ষে মায়া বা জগতরূপে প্রকাশ পেলেও কখনই জগত দ্বারা আবৃত বা লিপ্ত হতে পারে না। যতই বিচার করা যাবে ততই আমাদের মন পরমাকাশে উঠে যাবে এবং দেখবে নির্দ্দোষ পরমাত্মা-তে মায়া বা জগত নেই। উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখলে, যেখানে আকাশকে নীলবর্ণ দেখছি, এখন সেই নীলবর্ণের কাছে পৌছলে দেখতে পাব যে, সত্য সত্যই সেখানে আর নীলবর্ণ নেই, দৃষ্টির ভ্রমের জন্য নীলবর্ণ দেখছিলে। এখন ওখানে শুধু আকাশ রয়েছে। সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় এই মায়া জগত আছে বলে দেখাচ্ছে কিন্তু তত্ত্ব বিচার(পরমাত্মার) দ্বারা অনুসন্ধান করলে বা প্রকৃত জ্ঞান হলে, মায়া বা জগত বলে পৃথক কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই। এজন্য মায়া বা অজ্ঞানতাকে অবিনাশী বলা যায় না। তাই জ্ঞান হলে অজ্ঞানতা চলে যায়,

ঠিক যেমন আলোর দ্বারা অন্ধকার দূর হয় । একজন অপর জনের পরিপূরক মাত্র ।

মায়া বা মনের (অজ্ঞানের) বাস্তবে কোনরূপ নেই । রৌদ্রের তাপে যেমন বরফ গলে যায়, তেমনি বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে জ্ঞান হলে, অভিভূত ব্যক্তির মায়া আর থাকে না, বিগলিত হয়ে যায় । মায়া – বস্তু কি অবস্তু, বিচার করলে মায়া আর থাকে না । পঞ্চদশীতে – ভূত বিবেক,দ্বৈতাদ্বৈত বিবেক,পঞ্চকোণ বিবেক,মহাকাব্য -বিবেকাদির দ্বারা তত্ত্ব বিচার করলে অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায় ।সমস্ত মায়ার খেলাই আশ্চর্য্যের, তাই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল তাতে সন্দেহ নেই, এটা প্রত্যেকেরই মনের উপলব্ধির বিষয়, এখানে যার যেমন স্থিতি তার সেইরূপ উপলব্ধি । মায়া ও মন আগন্তুক তাই মিথ্যা । " অঘটন -ঘটন -পটীয়সী মায়া " ।

অষ্টবক্র মুনির আত্মতত্ত্ব শুনে রাজর্ষি জনকের মোহ - নিদ্রা ভেঙেঁ ছিল, যেমন — অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো....মোহেনৈব বিড়ম্বিত ।(অঃসং)

" আমি নিরঞ্জন, শান্ত, নিত্য, বোধস্বরূপ, প্রকৃতি(মন) হতে অতীত । আমি এতদিন মায়া-মোহবশে বিড়ম্বিত হচ্ছিলাম । "

"রজ্জুতে সর্প ভ্রম" – সর্প আছে বলে অকাট্য বিশ্বাস জন্মে,তাই সর্প প্রত্যক্ষ দেখতে পাই । সর্প সৃষ্টিই হয়নি – তা আবার ধ্বংস হবে কি ? ওটা মনেরই কল্পিত ভ্রমরূপী সর্প । অজ্ঞানেতে সর্প ছিল, জ্ঞান হলেই সর্প থাকবে না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এঁদেরও শরীর অবিদ্যামূলক । চিৎস্বরূপ আত্মা ব্রহ্মাদিরও পিতা । জগতে যত নাম আছে, সেই সমস্তই আত্মারই নাম, যত জ্ঞান আছে সে-সবেরই কর্ত্তা পরমাত্মা বা তিনি । সুতরাং তিনিই সব (তত্ত্বমসি -সামবেদের মহাকাব্য ।)

তিনিই জানেন তিনিই বন্দনীয় ও পূজনীয় । যে ব্যক্তি তাঁতে জানেন, সে ব্যক্তির তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ । জীব ভাব থেকেই, জরা-মরণাদি, ভয় আর্বিভূত হয় । জীব নিজেকে জানে না বা চেনে না ফলে দুঃখ পায় । সেজন্য সর্বপ্রথম নিজেকেই জানতে হয় বা চিনতে হয় । নিজেকে জানলেই সব জানা যায় বা সব চেনা যায় । নিজের মনকে যখন নিজেই জানতে পারবে বা ধরতে পারবে তখন সকলকেই জানতে ও বুঝতে পারবে । নিজের মন স্থির না হলে, অন্যের মন দেখা যায় না বা ধরা যায় না ।

পরমাত্মাতে অজ্ঞান শক্তি আছে বলেই - নাম ও রূপের সং সেজে জগত-সংসার প্রকাশ পাচ্ছে। বাস্তবিক কোন কিছুই আত্মা হতে পৃথক নয়। যেমন আলো ছাড়া ছায়া দেখা যায় না বা ছায়া নাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইমতো আত্মজ্ঞান ছাড়া অজ্ঞানকে দেখা যায় না বা অজ্ঞান নষ্টও হয় না।

সুতরাং মায়া বা মন (অজ্ঞান) কোথা হতে উৎপন্ন হলো, এরূপ বিচার বা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। নিজে মায়াকে(অজ্ঞানকে) কিরূপে বিনষ্ট করতে পারি, সেই বিচার করাই শ্রেয়। মায়া বা অবিদ্যা যেখান থেকেই আসুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মায়া বা অবিদ্যা ওরা ওদের কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। আমার কাজ আমাকেই করতে হবে, তাতে যে কেউ আমাকে - ভাল বা মন্দ বলুক না কেন, নিন্দা বা স্তুতি যেটাই করুক না কেন, তাতে আমার কোন কিছুতেই "এক কণাও"কমবে না বা বাড়বে না। নিজের স্থিতির দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। অপরের স্থিতি বাড়লো না কমলো তাতে আমার কিছু আসে যায়না। ওতে আমার কোন জ্ঞান-অজ্ঞান বাড়বে বা কমবে না, আমার যতটুকু থাকবার থাকবেই, যা হবার হবেই - কোনপ্রকার লাভ-ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই নেই। জ্ঞান-ক্রিয়া ও ইচ্ছার দ্বারাই শক্তি, সামর্থ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়। জ্ঞানের তারতম্য আছে - যেমন সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান,মহাজ্ঞান ইত্যাদি। নিজেকে জানা ও চেনাই হচ্ছে - আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শনই সত্যদর্শন তাছাড়া যা কিছু দেখি তা ভুল দর্শন বা অজ্ঞান দর্শন। সবশেষে জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধন-মুক্তি, সত্য-অসত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে দ্বন্দ্বাতীত স্থিতি লাভ। যদি কেউ উঁচুস্থান হতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে, তাকে যদি বার বার শুধুই প্রশ্ন করা হয় যে - সে কত হাত উঁচু থেকে পরেছে, সে স্থানটি কোথায়? কটার সময় পড়েছে? কি কাজের জন্য ঐ উঁচু স্থানে উঠেছিল? সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব প্রশ্নকরা নিরর্থক। কারণ, তাতে ভাঙ্গা পা ভাল হবে না। বরং তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে ভাঙ্গা পা জোরা বা পা যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে বা পা যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই অজ্ঞান বিষয়েও সেইরূপ, কত উঁচু থেকে পড়েছিল বা কিজন্য উঠেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করা একেবারেই নিরর্থক। ভূল হয়েছে এই বোধ আসলে, আর সে ভূল থাকে না বা আসেনা। স্বপ্ন দেখাটা অজ্ঞানতার লক্ষণ কারণ,স্বপ্ন - দুঃখ বা সুখ দুই-ই। সুতরাং অজ্ঞান কি? অজ্ঞান কাহার? এ প্রশ্ন নিরর্থক।

একটি গল্প শোনান যাক, - বিমলকে আমার বাড়ীতে প্রায়ই ১০টায় এসে গল্প করতে শুনি রাজনীতি, সমাজনীতি, খেলাধূলা, গান, টিভির সংবাদ, কাগজের সংবাদ আরও কত বিভিন্ন বিষয়ে । ও শুধু নিজের কথা শুনাতেই চায়, অন্য কারও কথা শুনতে চায় না এবং পছন্দও করেনা । অন্য কেউ কথা বললে - তর্ক-বিতর্ক করে, অযথা বাক্-বিতন্ডার সৃষ্টি করে, শেষ পর্য্যন্ত নিজেই বিরক্ত হয়ে,

" এখন আমার অনেক কাজ, বলে চলে যায় । "

একদিন বিমলকে বললাম, "যাওতো ঐ ঘরে খাটের নীচে বেড়ালে বাচ্চা দিয়েছে, ভাল করে দেকে এসো তো !"।

বিমল - দাদা ! ভাল করে দেখে এসেছি ।

আমি - বিমল, বিড়াল ছানা কটা হয়েছে ?

বিমল - "ক'টা হয়েছে তাতো দেখিনি, যাই দেখে আসি ।"

আমি - ক'টা হয়েছে ভাল করে গুণে দেখেছ তো ?

বিমল - হ্যাঁ দাদা ! ভাল করে গুণে এসে বলছি, বিড়াল ছানা ৩টে হয়েছে ।

আমি - কি রংয়ের হয়েছে ?

বিমল - এর আগে তো আপনি বলেননি, বিড়াল ছানা কি রংয়ের হয়েছে ? শুধু বলেছিলেন ভাল করে দেখে এসো কটা হয়েছে ? আবার যাই কটা কি রংয়ের দেখে আসি ।

আমি - ভাল করে দেখেছো তো ?

বিমল - শেয়ালী রংয়ের একটি, কালো রংয়ের একটি আর সাদা রংয়ের একটি ।

আমি - তুমি অনুমানে দেখেছো, নাকি প্রত্যক্ষ দেখেছো ?

বিমল - অনুমান না প্রত্যক্ষ করে দেখা কিছুই বুঝিনা, আমি যা দেখেছি তাই সত্যি করে, ভাল ভাবে দেখেছি । (বিরক্ত ভাবে)চলুন আমরা দুজনে গিয়ে ভাল করে দেখে আসি ।

আমি আর বিমল দুজনেই দেখতে পেলাম- মেয়ে ছানা ২টি, পুরুষ ছানা ১টি । ধুসর বর্নের ১টি পুরুষ ছানা, ১টি কালো সাদা মিশানো আরেকটি মেয়ে ছানা বাদামী । বিমল আংশিক দেখেছিল, পূর্নভাবে দেখেনি কারণ, সে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিল তাই, দেখার মত দেখেনি । সেটা দেখতে গেলে যে সময় ও নিষ্ঠা প্রয়োজন তা ওর ছিল না ।

জীবের জীবত্বের একমাত্র কারণই হচ্ছে, মন। মানুষের এই স্থূল শরীরের যেমন -হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র হয়ে একটি দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ,মাৎসর্য, হিংসা, দ্বেষ ও দম্ভাদি একত্র হয়ে মন গঠিত হয়েছে।

দেহ(স্থূল) বা শরীর বাদ দিলে যেমন মানুষের শরীরের অস্তিত্বই থাকে না, থাকে শুধু সুক্ষ্মদেহ, কারণ দেহ ও মহাকারণ দেহ। তেমনি সকল রিপু বাদ দিলে মনের অস্তিত্বও লোপ পায়। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ থেকেই রিপুসকল সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেজন্য মনকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিও বলা হয়। সত্ত্বগুণ - সুখের, রজোগুণ - কর্মের এবং তমোগুণ - বিপদের সৃষ্টি করে।

আমাদের এই স্থূলদেহ স্ব-প্রকাশ নয়, মনের প্রকাশই দেহের প্রকাশ। যতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ দেহের প্রকাশ। মন চলে গেলে দেহের প্রকাশ আর থাকে না। মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয়ে যুক্ত না থাকে, ততক্ষণ দর্শন-শ্রবণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। যদি দেহ স্ব-প্রকাশই হতো,তবে নিদ্রিত এবং মৃতব্যক্তির দেহও ক্রিয়াশীল থাকতো। সুতরাং মনের প্রকাশেই দেহের প্রকাশ। আবার এই মনও স্ব-প্রকাশ নয়। মন জড় — কারণ, সামান্য কারণেই এর পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন জড় পদার্থের ধর্ম। আত্মার প্রকাশেই মনের প্রকাশ। মনের উপর আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে এবং এর জড়ত্ব হ্রাস করে একে চেতনের ন্যায় বোধ করিয়ে দেয়।

হারিকেনের আগুন যেমন চিমনীর ভিতর দিয়ে বের হয়ে অন্ধকার গৃহকে আলোকিত করে ঠিক সেইরূপ আমাদের দেহের ভিতরের(দেহী) আত্মার চৈতন্যের চেতনাশক্তিও মন-চিমনীর ভিতর দিয়ে এই দেহ গৃহকে চেতনবৎ করে রাখে। রাত্রিতে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের উপর পড়লে আমরা সূর্য্যের আলো না বলে চন্দ্রের আলোই বলে থাকি। ঠিক সেরূপ -পরমাত্মার চেতনা, মনের যোগে দেহের উপর পতিত হচ্ছে বুঝতে না পেরে আমরা মনেরই চেতনা বলে থাকি। এই কারণে মন কখনও সবল, আবার কখনও দূর্বল বা তার অপ্রকাশ দেখা যায়। স্ব-প্রকাশ বস্তুর প্রকাশ কখনও নষ্ট হয় না। প্রমাণস্বরূপ - চন্দ্র নিজে স্ব-প্রকাশ নয় সূর্য্যের নিকট হতে আলো ধার করে আমাদের আলো দেয়, সেজন্য চন্দ্রলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু, সূর্য্য স্বপ্রকাশ তাই তাঁর প্রকাশের

কখনও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই রূপ আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অস্তিত্বস্বরূপ একমাত্র আত্মাই স্ব-প্রকাশ,তাই তাঁর কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না বা কখনও পরিবর্তন হয় না। এই আত্মার প্রকাশেই মনের প্রকাশ। আমরা মনের ভিতর দিয়ে যে প্রকাশক চৈতন্যের আলোক পাচ্ছি, সেটা মনের নিজের নয়, সেটা সেই স্ব-প্রকাশ আত্মারই আলোক।

বিশ্ব সংসারে মানুষের বা জীবের অস্তিত্ব এই মনঃশক্তি দ্বারাই সাধিত হচ্ছে, যেমন ইলেকট্রীক শক্তিতেই ট্রেন চলছে।"দেহই আমি" এই অহংবুদ্ধি স্থাপন্ করে "মন "নিজে ভিতরে বসে ইলেকট্রীকের মত ক্রিয়া করতে থাকে। আমি মানুষ – এই সংস্কারে মনের পশুর সাথে না মিশে, মানুষের দলেই মিশে আছি এইভাবে সর্ব্বদাই মন দেহের উপরে "আমি আছি " এই অস্তিত্ব বোধে শুধু সৎকর্ম করতে যায়। ক্ষুদ্র অহং(মন) থেকে বৃহৎ আমি, বৃহৎ অহং-এতে অবস্থান। ক্ষুদ্র অহং -অজ্ঞানতা বা দেহত্ব বোধ,ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেই ঘোরপাক খাওয়া। মন ও মায়ায় আবদ্ধ থাকা বা সব কিছুর বন্ধনে জড়িয়ে থাকা। বৃহৎ অহং অর্থে -- বিস্তার, মুক্ত, কামনা-বাসনা, সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হওয়া। নিজেকে চেনা ও জানা, নিত্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাকেই -আত্মদর্শন বলে। আত্মদর্শনের পর আত্মজ্ঞান, মহাপ্রকাশ, স্বরূপত্ব প্রাপ্ত, জ্ঞানজ্যোতির মাধ্যমে সবকিছুর জ্ঞান লাভ করা। তখন আর কিছুই জানার বাকি থাকে না।

মন মরে না মায়া মরে , মরে যায় শরীর।
আশা তৃষ্ণা নাহি মরে , কহে দাস কবীর ।।

নূতন কাপড় পড়লে -আমাদের চক্ষু, নাসিকা, হস্ত-পদের বা রূপের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করলেও, আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মন, মায়া, অজ্ঞানতা ও সংস্কারাদির হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, পূর্ব্বের মতই থেকে যায়।

এমন কি, সুক্ষ্ম দেহে বা নাড়ী পথে চলে গেলেও সাধারণ লোক দেখতে পায় না ও এই জগতের দেহ বা কোন দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে পারে না কিন্তু, শুধু সাধক ও যোগীগণ জ্যোতিরূপে দেখতে পায় কারণ – আত্মাই জ্যোতিরূপ। তাই কোন সাধক, জ্ঞানী ও যোগীজন আত্মারই পূজা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন থাকেন।

মনোযোগের সাথে শোনা দরকার -" বাক্যমনের অগোচর "– পরমাত্মতত্ত্ব, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত দেশে(সমাধিতে) গিয়েই অনুভব, প্রত্যেক্ষ, ও অপরোক্ষ করতে হয়। মন হচ্ছে সীমার অধীন, দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন, সুতরাং মন সীমার বাইরে যেতে পারে না বটে, কিন্তু জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মনের উর্দ্ধে যাওয়ার শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে। শুধু যোগাভ্যাসের দ্বারাই ঐ শক্তির জাগরণ হয়। আমরা ইচ্ছা করলেই মনের উর্দ্ধে উঠিতে পারি না। ধর্ম্ম কাহাকেও সঠিক বুঝতে পারে না বা আত্মউপলব্ধিও করতে পারে না। ধর্ম বক্তৃতার বা শুধু মুখের কথার জিনিস নয়, এটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, মনের সীমানার বাইরে গিয়েই উপলব্ধি করতে হয় (অন্তঃমুখী)।

আমরা পৃথিবীতে থেকে কেউ-ই পৃথিবী যে ঘুরছে তা দেখতে পাই না। কেবল সূর্য্য ও চন্দ্র ঘুরছে, পৃথিবী স্থির আছে -- তাই দেখি। কিন্তু যদি পৃথিবীর ঘুর্ণন দেখতে চাই, তবে পৃথিবীর বাইরে সেই চন্দ্র-মন্ডলে যেতে হবে। তখন সত্য-সত্যই দেখতে পাব যে, পৃথিবী কিরূপ বেগে ঘুরছে এবং চন্দ্র এই পৃথিবীর মত স্থির আছে। সেইরূপ মায়া-রাজ্য বা মন-রাজ্য ত্যাগ করে তার বাইরে আত্মরাজ্যে অর্থাৎ জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারলে কেউ-ই সেই মনের চঞ্চলতা বা অজ্ঞানতা বুঝতে পারে না। এমনকি আত্মার স্থিরতা, নির্ব্বিকারতা ও শান্তভাব কিছুতেই বুঝতে পারে না।

আরও বুঝতে হবে – মায়ারাজ্য থেকে বের হয়ে (চিদাকাশে)আত্মসূর্য্যের দর্শন করে স্থির থাকা বা শান্ত হওয়াও সাধারণ মস্তিষ্ক ও মনঃশক্তির কর্ম নয়। বেদান্তে আছে – " নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ " অর্থাৎ বলহীন(মনঃশক্তিহীন) ব্যক্তি কখনও আত্মজ্ঞান লাভ বা আত্মদর্শন করতে পারে না। মহাশক্তি বা শক্তিশালী মনকে বশে রেখে -- নামে, গানে, জপে, ধ্যানে, বা অভ্যাস-যোগে থাকলে (৩-৪ মিনিট) সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবেই, তাতে বিন্দুমাত্র ভূল নেই।
আদিশঙ্করাচার্য্য বলতেন —

" জিতং জগৎ কেন ? মন্নো হি যেন "

অর্থাৎ " কে জগতকে জয় করেছে ? যে মনকে জয় করেছে। "
ভক্তবীর তুলসীদাস বলতেন —

"রাজা রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মনকো বশ করে যো, সব কো সেরা ওই।।"

প্রকৃত রাজা - নির্বিঘ্নে প্রজাদের বিচার ও শাসন করতে পারে ।
প্রকৃত যোদ্ধা - নিজ পরাক্রম-বলে যুদ্ধে জয়ী হন ।
প্রকৃত যোগী - শক্তিশালী মনকে বশীভূত করতে পারে, সেজন্য তিনি রাজা ও যোদ্ধা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।

যাদের মন খুব দুর্বল ও ভীতু, তাদের শরীরে ভূত চেঁপে বসে । আর যারা ভূত আছে বলে মোটেই স্বীকার করে না, মনের শক্তি যাদের অত্যন্ত প্রবল, ভূত তাঁদের শরীরে চাঁপা দূরের কথা,তাঁদের দেখলেই ভূত দূরে পালিয়ে যায় ।

বর্হিজগত মন কিছুতেই অর্ন্তজগতে যেতে চায় না । ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হলে, কুসংস্কারাদি মুক্ত হয়ে, বদ্ধযুক্ত মায়া ক্ষীণ হবার পর, মন অনেকটাই চিত্তাকাশে থাকে অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হয় । তখনই মন-রাজ্য হতে মন বের হয়ে আত্মসূর্য্যের দর্শন (শত চেষ্টাতেও ২-৩ সেকেন্ড হয় না) করে এবং শান্তির জগৎ(অন্তঃজগত)-এর সাথে বহিঃজগৎ-এর প্রবল যুদ্ধ হয় তাকে বলে "সাধন সমর " সত্য জ্ঞান লাভ " একেতে বা একৎতে স্থিতি "- এক মাত্র আত্মাই থাকে, এটিই বিন্দুদর্শন বা আত্মদর্শন বা সত্যদর্শন ।

মনাতীত মনকে চালানো।

বিষয় বাসনা ভোগ, প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন, সঙ্গীত শ্রবণ, খেলাদি দর্শন, টি.ভি, রেডিও, ফোন, নানাপ্রকার সংবাদ প্রভৃতিতে মন লাগালে ক্ষণিকের জন্য শান্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পর মূহুর্ত্তেই মন ছট্ফট্ করতে থাকে । যে পর্যন্ত মন তাঁর নিজের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে সঠিক জানতে না পারবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই মনের শান্তি হতে পারে না বা মন শান্ত হয় না ।

বিচার-বিবেচনা, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য, নিজের অনুভবের দ্বারা নিজেই নিজের জীবনের সব বিষয় তন্ন-তন্ন করে পর্য্যালোচনা করলে নিজেই স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, মন কোন দিকে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে ।

ছোটবেলায় জানতাম ভগবান মন্দিরাদিতে থাকেন । বড় হয়ে নানা ধর্ম সভায় স‍্ৎসঙ্গঁ ও সৎপ্রসঙ্গেঁ শুনেছি - "ভগবান সর্ব্বব্যাপী "। যদি তিনি সর্ব্বব্যাপী থাকেন,

তাহলে তিনি আমাকেও ব্যাপীয়া আছেন -- এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । কাজেই আমাকে বাদ দিয়া সেই ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না । সুতরাং তিনি যখন আমার ভেতরে-বাইরে ব্যাপিয়া আছেন,তখন আমার ভেতরে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলে তো সেই ভগবানকেই পাওয়া যাইবে । ইহাই হইল – " পরমতত্ত্ব " বা " আত্মজ্ঞান " ।

অতএব, ভগবান আমার এতো কাছে থাকতেও হাত তুলে "এসো প্রভু, এসো " বলে চিৎকার করছি আর অনর্থক দূর-দূরান্তরে, এ তীর্থে - সে তীর্থে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছি । কেনই বা পরমেশ্বরকে নিজ হতে অনেক দূরে কল্পনা করে নানা প্রকারের দেব-দেবীর প্রস্তুত করছি । কোনরূপ শরীর চালনা না করেও কেবল মনোবৃত্তির অবরোধ দ্বারাই পরমার্থ লাভ করা যায় ।

সুখাসনে বসে যথাসম্ভব ভোজন, ভোগবাসনা বিসর্জ্জন, সৎপথের অনুসরণ, দেশ কাল, স্থান, পাত্র অনুযায়ী পথের বিচার,সদ্‌গুরু ও সাধুসন্তের উপদেশাবলী এবং আলোচনা - এই সকল উপায়ে সংসার শান্তিজনক পরমাত্মবোধ-সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

উপাসনা করবো,উপাসনা করবো বলে যে চিৎকার করছি, উপাসনা শব্দের অর্থ হচ্ছে, উপ=নিকটে, আসীন=বসা অর্থাৎ নিকটে উপবেশন করা । যথার্থ অর্থ হচ্ছে আমার মন আমার আত্মার নিকট উপবেশন করবে । আমার দেহ একস্থানে বসে থাকলেও মন সর্বদাই নানাস্থানে দেশ-বিদেশে রসাস্বাদনের জন্য ঘুরে বেড়ায়,অল্পক্ষণের জন্যেও আমার নিকট উপবিষ্ট হয় না । যখন ঐ মন ছোটাছুটি বা চঞ্চলতা ত্যাগ করে, শান্তভাবে আমার নিকট উপবেশন করবে, তখন সেই মন আমার আত্মার নিকটও উপবেশন করবে । যিনি নিজ মনের চঞ্চলতা ধরতে পেরে তাকে স্থির করতে পেরেছেন, তিনি স্বয়ং মনসকলকে আয়ত্বে ও মনের সংবাদ জানতে পারবেন । অন্যে তা কিরূপে পারবে ?

সত্য কথা বা সত্যদর্শন।

স্থূলদেহ থাকতে সত্য কথা ও সত্যদর্শন হয় না, কথাটা মিথ্যা বলে মনে হলেও এটি সত্য । স্থূলদেহেতে থাকাকালীনই কিন্তু স্থূলদেহ বলে মন ভূল করে

কিন্তু তা সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গ শরীরে হয়। আমাদের শরীর থাকতেও সত্য দর্শন হয়।

শরীর বা দেহ প্রকারের স্তর চারটি ঃ-

১) স্থূলদেহ, ২) সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গঁদেহ, ৩) কারণদেহ, ৪) মহাকারণদেহ

ক) স্থূলদেহ – পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত,তিনটী গুণ যথা – তন্মাত্র, মহাভূত, জৈবদেহ, মাটী ও জলের আধিক্যই বেশী, ইন্দিয়াদি অশুদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়ই থাকে।

খ) সুক্ষ্মদেহ – অগ্নি, বায়ু, আকাশ থাকে। মাটী ও জল থাকে না।

গ) কারণদেহ – শব্দাতীত (বাক্যাতীত), মনাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত।

ঘ) মহাকারণদেহ – যার আদি-অন্ত নেই, সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই। যা দৃশ্য হয় সকলই তারই দেহ, সৃষ্টি করে,সৃষ্টির মধ্যেই আছে বাইরেও আছে। কোথায় নেই, সবচেয়ে কাছে আছেন আমার আত্মা, ভগবান থাকা অবধি আমার স্থূলদেহের অস্তিত্ব সুতরাং স্থূল দেহেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও মহাজ্ঞানের চৈতন্য হয়। তাকেই বলে দিব্য দেহ,দিব্য জীবন(দেহ) দিব্যজ্ঞান। এ'কের সঙ্গেঁই দিব্যলীলা হয়, এ'কের মধ্যেই সবকিছু পাওয়া যায় আর দ্বিতীয়ের প্রয়োজন হয় না। এ লীলা রাধাকৃষ্ণের লীলা নয় এটা হচ্ছে পরমশিব ও অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা। রাধাকৃষ্ণের লীলা বহু প্রকারের হয়েছিল,লীলাবিলাসের মধ্যে আসার কাছে "গোষ্ঠ লীলা"-নৌকাবিলাস বান্ধবদের নিয়ে হয়েছিল যেমন-বলাই,সুবল, শ্রীদাম,সুদাম,উদ্ধব প্রভৃতির সাথে। বৃন্দাবন লীলা মুখ্যতঃ সখীদের সাথেই হয়ে ছিল সেখানে কোন বন্ধুবান্ধবদের স্থান বা উপস্থিতি ছিলনা শুধু সখীদের নিয়ে হয়েছিল। বস্ত্রহরণ ও নৌকা বিলাস ও শুধু সখীদের নিয়ে একান্তে হয়েছিল। কৃষ্ণের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা, রাসলীলাই একমাত্র গভীর তাৎপর্য্য ও যথার্থ লীলার সাক্ষী। ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন -

১)ললিতা, ২)অনুরাধা, ৩)বিশাখা (ইন্দুলেখা), ৪)তুঙ্গবিদ্দা, ৫)নান্দীমুখী, ৬)রঙ্গদেবী, ৭)সুদেবী, ৮)চিত্রা। ঐ সখীদের বস্ত্রের রং,অলংকারও বিভিন্ন ছিল শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করার জন্য। বৃন্দাবনের ভৌম রাসলীলা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেও আছে – তাহা অপ্রাকৃত স্থলে, বৈকুণ্ঠেরও উপরে গোলকে।

সংকল্প ও বাসনা।

তুমি কোন বিখ্যাত যোগী বা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রগ্রহণ বা উপদেশ গ্রহণ করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ মনের জাগরণ হবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। সেজন্য তোমাকে অধিকারী হতে হবে অর্থাৎ শাস্ত্র, গুরু ও নিজস্ব অনুভবের মধ্যে চলতে হবে। তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ তোমাকেই সহ্য করতে হবে। আধ্যাত্মিক তাপ, আদিদৈবিক তাপ ও আদিভৌতিক তাপ ক্রমশঃ কমে আসার সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ তোমার কামনা বাসনা বা জাগতিক চাহিদাও অনেকটাই কমতে থাকবে। এরপর তোমার দুঃখে যদি তোমার একান্ত প্রিয়জন বা ভক্ত কেউ করুণায় বার বার বিগলিত হনও,তবুও তোমার প্রারব্ধ তোমাকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু, তোমার প্রিয়জন বা ভক্ত তোমার পাশে থেকে যদি ত্রিতাপ ও প্রারব্ধভোগের সময় বা তোমার সাধন পথে চলার সময় তোমাকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে নানাপ্রকারের সাহায্য করে সেটা শুধুমাত্র জাগতিক হিসাবে বা রূপেই করবে।

ভক্ত দু'প্রকারের দেখতে পাওয়া যায়, অন্তরঙ্গঁভক্ত ও বহিরঙ্গঁভক্ত। তুমি অন্তরঙ্গঁভক্ত না বহিরঙ্গঁভক্ত তা তুমি স্বয়ং তোমার আচার-ব্যবহার ও প্রত্যানুভূতির দ্বারাই বার বার বুঝতে পারবে। এমনকি,তোমার আত্মারূপে, তোমার ভিতরের অন্তঃস্থলে থেকে তোমাকে সর্ববিষয়ে, সর্বতোভাবে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তোমাকে শুদ্ধ, শুদ্ধতর হতে শুদ্ধতম পথে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে এবং গন্তব্য স্থলের অতি সন্নিবর্তী স্থানে এই দীর্ঘতম পথ পরিক্রমার জন্য বিশ্রাম নেওয়া হচ্ছে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা গন্তব্যস্থানে পৌছানো। এই বিশ্রামের সময় অচিন্ত্যমহাশক্তির লীলাবিলাস ও লীলারসের আস্বাদন করা হচ্ছে। এই লীলারস বা সাম্যরস বা অমৃতরসের জন্যই প্রকৃত যোগীর যোগসাধন - এটাই অর্দ্ধনারীশ্বর সাধনা বা আস্বাদনের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গেঁ তাদাত্ম্যবোধ। এই জন্য প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সাধক বা আত্মজ্ঞানীগণ শুধু নির্বাণ, মোক্ষ, মুক্তি

বা লয় হতে চান না। ভক্তের সাধনানুসারে তাঁর সেরূপগুরু যেমন হয়, তেমনি গুরুরও সাধনানুসারে সেরূপ শিষ্যের সাথে যোগাযোগ হয়। একবার যোগাযোগ হলে অর্থাৎ একাত্ম হলে, দুই বিন্দু এক বিন্দুতে মিলে গিয়ে এক বিন্দুই থাকে, তখনই তাকে বলে — একং নিত্যং বিমল মচলং। ভক্তের সংকল্প ও বাসনা অনেকটাই ক্ষীণ হওয়াতে বা চলে যাওয়াতে বা সকল দিকেই সাত্ত্বিকতার প্রকাশ ও বিকাশ জন্য, গুরু বা যোগী নানা দেশ, নানাতীর্থ, বনভূমি প্রভৃতি পরিব্রাজক অবস্থার পর, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, নিত্য-অনিত্য প্রভৃতির পর সঙ্কল্প ও বাসনা ক্ষয় হওয়ার পর, সেরূপ ভক্তের সাথেই যোগ হয়। প্রকৃত পক্ষে কামনা বাসনা ও সঙ্কল্প থেকে নির্বিকারই হচ্ছে উচ্চকোটী যোগী বা সাধকের লক্ষণ। কামনা - বাসনা ও সঙ্কল্প খুব সুক্ষ্মতম অবস্থায় থাকে। সঙ্কল্প থেকে কর্মের উৎপত্তি ও সূচনা হয়। কর্ম থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

আত্মজ্ঞান সম্পন্ন গুরুই সদ্‌গুরু নামে পরিচিত। আত্মজ্ঞান ছাড়া সদ্‌গুরু হতে পারে না। সেজন্য যে গুরু কামনা-বাসনা ত্যাগ করার পর কোনরূপ সঙ্কল্প করে না, তিনিই সদ্‌গুরু। অবশ্য ভক্ত ও সাধকদের সঙ্কল্প প্রথমতঃ থাকে তারপর মন্দিরাদি, তীর্থদর্শনাদি প্রভৃতি দর্শনও থাকে না। নিজের চক্ষু উন্মীলিত হলে বাইরের কোন দৃশ্যই দেখার সঙ্কল্প জন্মায় না, বাইরের কোন কিছু দর্শনের সঙ্কল্প বা বাসনা না জন্মানোর জন্য কোন স্পৃহা আসতে পারে না। সদ্‌গুরুর কোনরূপ বেশভূষা যেমন থাকে না তেমনি কোন বেশভূষার প্রতি লক্ষ্যও থাকে না।

এজগৎ — সংকল্পের দ্বারা, কামনা-বাসনার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা সঙ্কল্প ও বাসনা ছাড়া অন্যকিছু নয়। মনের দ্বারাই মনকে এবং সঙ্কল্প দ্বারাই সঙ্কল্পকে মুক্ত করতে হয় অর্থাৎ সঙ্কল্প বা বাসনা করবো না। সঙ্কল্প দ্বারাই সঙ্কল্পকে ক্ষীন করতে হয়।

জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা - এসমস্তই সংকল্পের রূপান্তর মাত্র। কাজেই যা কিছু দেখি বা যেরূপ দেখি - সকলই সংকল্প ও বাসনার দ্বারাই সৃষ্টি। সুতরাং মন অর্ন্তমুখী হলে সহজেই সংকল্প ও কামনা-বাসনা দূর হয়ে আত্মাতে স্থিতিলাভ হয়, তারপর আত্মজ্ঞানান্তে প্রকৃত সত্য দর্শন হয়ে থাকে, সেটাই স্বরূপ দর্শন অর্থাৎ অখন্ডমন্ডলাকার। কোন হাত-পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি থাকে না। থাকার মধ্যে থাকে একমাত্র গোলাকার শুভ্র জ্যোতিই।

৩ যোগের অধিকারী । ৫

বিষয় বৈরাগ্য না জন্মিলে সম্পূর্ন যোগের অধিকারী হওয়া যায় না । বর্হিমুখী ও অন্তঃমুখী দুই অবস্থা আছে । মানুষের চিন্তা কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা জন্মের পরই বোঝা যায় । অধিকাংশ মানুষই বর্হিমুখী থাকে এবং সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়ে একবার জন্মাচ্ছে, আরেকবার মরছে - এরূপ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে । এমনকি, বেশীর ভাগ মানুষই হিংসা, দ্বেষ, মোহ, মায়া, মাৎসর্য্য, লোভ প্রভৃতির ভিতর একমাত্র বিষয়-বাসনা ও কামনাকে আশ্রয় করে এবং ত্রিতাপে বার-বার দগ্ধ হয় । কিন্তু, একমাত্র অচিন্ত্যশক্তির আকর্ষণেই পথ হারানো পথের সংবাদ পাওয়া যায়, ঐ পথ কিছুটা দীর্ঘ তা বলাই বাহুল্য । পথ চলার পর পথের নানা দৃশ্য ও শোভা দেখে অনেকেই থেমে গিয়ে, নানা বিভূতি ও আলৌকিকত্বে ডুবে যায় এবং বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন — বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অন্নক্ষেত্র, আশ্রম ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটায় ।

কর্ম অর্থে কামনা — তা শুভই হোক বা অশুভ, অজ্ঞান-কর্ম হোক বা জ্ঞান-কর্ম । কর্ম মানেই লিপ্ত হওয়া, সঙ্কল্প বা বিকল্প তখনও বোধ হয়নি, যেটিই হোক না কেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন কর্মই সর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় । পার্থিব ও অপার্থিব কর্ম - বিচার-বিবেচনা পর্ব বহুদিন চলার পর, কোনটা নিত্য-কর্ম, কোনটা নৈমিত্তিক, কোনটা পার্থিব কর্ম, কোনটা পারমার্থিক কর্ম — এই জ্ঞান আসলে যেটা জানা যায় তাকেই যোগস্থ কর্ম বলে । এই কর্ম করার পর শরণাগতি প্রাধান্য পায়, শরণাগতির মাধ্যমে,অনেকটাই বিষয়-বাসনা মুক্ত হয়ে অনুসন্ধান কার্য্য চলতে থাকে, শেষে বিরাগী হতে হতে (বিষয়-বাসনা-কামনা হতে) বৈরাগ্যে উপস্থিত হয় । সেটা লোক দেখানো বা সাজার বৈরাগ্য নয় সেখানে চাওয়া ও পাওয়ার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য থাকে না ।

বৈরাগ্য বিহীন মনে বিচার শক্তি জন্মে না, তাই সে যোগের সম্পূর্ণ অনধিকারী । বৈরাগ্য সহিত ধ্যান, ও সমাধির অভ্যাস থেকেই জ্ঞানযোগের সিদ্ধি লাভ হয় । যাঁরা মুখ্যাধিকারী তাদের প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি যোগের কোন প্রয়োজন নেই । শুধু ধারনা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীর দ্বারাই তাদের জ্ঞান ও যোগসিদ্ধি হতে পারে, এর অন্যথা হতে পারে না ।

ভোগ ও যোগ এক সাথে হয় না, যেমন – একই গৃহে একই সময়ে আলো ও অন্ধকার দু'টী থাকতে পারে না। অর্ন্তমুখী ও বহিঃমুখী সাধন প্রণালী আছে। বর্হিঃমুখী সাধন করতে করতে তাদের বাহ্যিক বাঁধা-বিঘ্ন দূর হওয়ার পর অর্ন্তমুখী সাধনা ও জ্ঞানলাভ, তাকেই আত্মজ্ঞান বলে। আত্মাই একমাত্র নিত্য।

৯৩ আত্মজ্ঞান ব্যাতীত মনঃশুদ্ধি অন্য কিছুতে হ'তে পাবে না। ৩২

প্রারব্ধ ছাড়া অন্যান্য কর্মকে জ্ঞান দগ্ধ করতে পারে। প্রারব্ধ – জ্ঞানী, যোগী প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়। মনের স্বভাব ভীষণ চঞ্চল, ভ্রমনরত - সেজন্যই নানা বাধা বিপদে পড়তে হয়, সুতরাং মন সংযত হলেই কর্মনাশ হয় বা সংকল্প আর হতে পারে না। সংকল্প যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে। ক্রমে-ক্রমে সকাম কর্ম নিঃস্বার্থ কর্মতে রূপান্তরীত হয়, কর্ম নাশকেই নিষ্কামকর্ম বলে। রূর্মনাশই - নিষ্কামকর্ম, যোগস্থকম, ব্রহ্মকর্ম বা আত্মকর্ম।

প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম(জ্যোতি) জ্ঞানচক্ষু – অন্যান্য জ্ঞানের পর বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান, পরে মহাজ্ঞান।

১) আত্মা, ব্রহ্ম, বা পরমাত্মা একই। আত্মার জ্ঞান আছে (দৃঢ়)।

২) আত্মদর্শন বা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠ জ্ঞান বা জ্ঞান শক্তিই আত্মশক্তি। অপরোক্ষজ্ঞান - ধারনা, ধ্যান ও সমাধি বা প্রত্যক্ষদর্শন হলে।

৩) সৎ,অসৎ বিচার ও বিবেকের দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে।

৪) বিচারশক্তি - বুদ্ধি ও বিবেকের মাধ্যমেই হয়। বুদ্ধি – বহিঃমুখী বৃত্তি, বিবেক – অন্তঃমুখী বৃত্তি।

৫) বহিঃমুখী বহিঃজগতের জ্ঞান - বিবেক হচ্ছে ভিতরের আত্মানুসন্ধান।

৬) বিবেক হতেই বিচার শক্তি জন্মে, সদাসদ্ ,ভালমন্দ পৃথক করবার যে শক্তি তারই নাম বিবেক।

৭) শ্রবণ ও মনন বিবেকের কারণ, কর্ম বিবেকের কারণ নয়।

৮) পূজা, যজ্ঞ, ভাগবতপাঠ, বেদ, পুরাণ, গীতা শতশত ধর্মগ্রন্থ পড়লে শুধু পরোক্ষ জ্ঞান হয়।

৯) পরোক্ষ জ্ঞান হল খন্ডজ্ঞান যা শুধু বহিঃজগতের জ্ঞান। তখন নানা জিজ্ঞাসা জন্মে; অর্ন্তজগতের দ্বার খুলে যায় এবং অর্ন্তজগতের মধ্যে শুধু প্রবেশ হয়।

১০) পরোক্ষ জ্ঞানের পর নানা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভবের পর অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

১১) অপরোক্ষ জ্ঞানের পর বৈরাগ্য, বিবেক লাভ হয়।

১২) আত্মজ্ঞানী সাধু-সন্ত ও মহাপুরুষদের উপদেশানুসারে আচরণ ও ব্যবহারেই শুধু দেহ-মনপ্রাণ অন্তঃমুখী হয়ে বিবেক বৈরাগ্য লাভ হয়।

১৩)আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদের একবার দেখা পেলে, সঙ্গ করলে, যে কোন প্রশ্নের উত্তর ধীরে ধীরে ভিতর থেকেই প্রতিধ্বনি রূপে পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নিজের ভিতর থেকেই হয়, নিজের ভিতরেই পাওয়া যায়।

১৪) আত্মজ্ঞান হলে কোনরূপ শাস্ত্র পড়া বা সৎগ্রন্থ পড়ার প্রয়োজন হয় না।

১৫) অন্তঃমুখী হ'তে যে জিজ্ঞাসা আসে তাহা প্রত্যাভিজ্ঞা, প্রত্যাভিজ্ঞায় নিজের ভিতর থেকেই উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই আত্মজ্ঞান পূর্বের দর্শন ও স্থিতি।

১৬) জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলো-অন্ধকার বিরুদ্ধ বস্তু, তারা কখনই এক আধারে থাকে না।

১৭) "আত্মজ্ঞানং (ব্রহ্ম) বিনা পার্থ সর্বকর্ম নিরর্থকম"। (গর্ভ গীতা)

১৮) আত্মজ্ঞানকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সর্বশেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন।

১৯) ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে - (গীতা) (অর্থাৎ - আত্মজ্ঞানের তুল্য মনঃশুদ্ধিকর বস্তু ত্রিভুবনে নেই)।

২০) আলোচনা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান বর্দ্ধিত হলেই মহাজ্ঞানের উদয় হয়।

২১) পঞ্চভূত জ্ঞান, বিবেক জ্ঞান, দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞান, নিত্য-অনিত্য জ্ঞান, ষট্‌চক্র জ্ঞান কুন্ডলিনীর জ্ঞানই, আত্মজ্ঞান রূপে পরিচিত।

২৩) আত্মজ্ঞান হচ্ছে — নিজের রূপকে জানা,তাকেই স্বরূপ বলা হয়। আত্মজ্ঞান কখনও মনের অধীন নয়, কর্মের অধীন নয়, আত্মজ্ঞান বস্তুর অধীন।

২৪) অজ্ঞানীজন — ভক্তি শ্রেষ্ঠ না জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলে যাঁরা বৃথা তর্ক করে থাকে — এঁরা জ্ঞানীও নয়, ভক্তও নয়, অহংকারে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারই তাদের লক্ষ্য।

সিদ্ধি বা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য।

কৈবল্যের পথে এগুলি আসতে থাকবেই বা প্রকাশ পাবেই। এ সমস্ত যদি নিজেদের সেবার জন্য,নিজেদের প্রচারের জন্য বা নিজস্ব শক্তির প্রভাবের জন্য বার বার প্রকাশ করতে থাকি, তাহলে আসুরিক সম্পদের "দাস" হয়ে থাকবো বা অসুরের স্বভাব এসে যাবে বা অসুরত্বের পরিচয় দেব।

সিদ্ধির দ্বারা সমাধির ব্যাঘাত ঘটে। সিদ্ধির অপর নাম বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের উর্দ্ধে মাধুর্য্য। মাধুর্য্যই সরলতা বা সহজতা, আরও উর্দ্ধে বলতে গেলে তাকেই প্রেম বলে। প্রেম শ্রীভগবানের সবচেয়ে বড় দান। প্রেম কোন কিছুর বিনিময়ে হয় না বা পাওয়া যায় না। এটা ভগবানের ষড় ঐশ্বর্য্যের প্রধান। প্রেম গুপ্ত ও গুহ্য, কখনও প্রকাশ পায় না। লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না বা — শব্দের দ্বারা প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। একমাত্র নৈঃশব্দের দ্বারা অনুমিত বা আস্বাদিত হয়। এর কোন বর্ণ নেই বা স্থান নেই বা একে কখনই গন্ডীবদ্ধ রাখা যায় না। তাই অসীম, অনন্ত, অনাদির আদি — এর কোন সংজ্ঞা নেই বা কোনরূপ সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এটি স্ব-স্ব চেতনার উন্মেষ বলা যেতে পারে তাই স্ব-স্ব আস্বাদন, সেজন্য প্রেমের ঐশ্বর্য্য ও মাধূর্য্য অপরিসীম।

সূর্য্যের আলো যেমন করে ফুল ফোটায়, — সেটা হলো মাধুর্য্যের ঐশ্বর্য্য, সেখানে সূর্যের চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। রাতের শিশির-বিন্দু, বাতাস, মাটি

প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টায় বা সমন্বয়ের মাধ্যমেই স্বাভাবিক ভাবে ও যথা সময়ে ফুলটি -ফোটে । এমনকি ফুলের গন্ধের দ্বারা বাতাস শুদ্ধ হয়, প্রানীকুল এসকল বায়ুর দ্বারাই প্রাণশক্তির মাধ্যমে জীবন ধারণ করে ।

সিদ্ধি, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা শুধু যদি আত্মসেবা করি তবে তা স্বার্থান্বেষী বা স্বার্থপর বা দানবীয় স্বভাবের পরিচয় হয়ে থাকে । তাই দিয়ে যদি শ্রীভগবানের সেবা করতে পারি, তাহলে দেব, দিব্য স্বভাবের স্ফুরণ হবে ।

অচিন্ত্যমহাশক্তি পাওয়া সহজ কথা নয়, – মহিষাসুর শুম্ভ-নিশুম্ভ, এঁরা সবাই শক্তি সাধনা করেছিল, কিন্তু সাধনায় ব্যর্থ হল, কারণ এঁরা শিবত্ব লাভ বা শিব না হয়ে শক্তিকে পানিগ্রহণ করতে যাওয়ায় ।

পৃথিবীতে অধিকার অনুসার প্রাপ্তি ঘটে । অধিকার অর্জন করতে হয়, সেজন্য সময় ও ধৈর্য্য-সহ্যেরও প্রয়োজন থাকে । অধিকার – চালাকী,কর্ত্তৃত্বাভিমান, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা অর্জিত হয় না । সহজ ও সরল হলেই হয় । দু'জনের মধ্যে যখন প্রকৃত প্রেম বা ভাবনার দ্বারা,কর্মের দ্বারা,আনন্দের মাধ্যমে মহাশক্তি ও মহাদেব(শিব) সমভাব বা সামরস্যের মহামিলন হয় অর্থাৎ একাত্ম, একদেহ হয়ে কাম বর্হিভূত শুভ শক্তির অবতরণ শুধু চৈতন্যযুক্ত আনন্দ লাভের মাধ্যমে অমৃতরস ক্ষরণ হয়, ভিতরে ও বাহিরে আনন্দের ঢেউ বহু সময়ের জন্য প্রবাহিত হতে থাকে, হর্ষণ ও লোমহর্ষণ প্রভৃতি অধিক ক্ষণের জন্য শ্রোতান্বিত হতে থাকে । একেই শিব শক্তির সামরস্য,অন্ততঃ একজনের অধিকার সাপেক্ষ একান্ত আবশ্যক (সিদ্ধদেহ) । এই সামরস্য চাহিদা দ্বারা, প্রলোভনের মাধ্যমে, দেহ বোধ থাকলে, ভয় উৎপন্ন হলে কোন ক্রমেই হওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু শিব শক্তির সামরস্য বলাৎকারের পথে, বা কোনপ্রকার প্রলোভনের পথে হবার নয় ।

অসুর প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ হল অহংকার । অহংকার দেখা দেয় গুরু-গিরিতে । মহাপুরুষদের ও অধিকারিক পুরুষদেরও উচ্চ দেবতাগণ অহংকার দিয়ে (আসুরী সম্পদ) ভোলান, কারণ ভাগবত জীবন লাভ করেও অনেকের স্খালন হতে পারে মোহ ও অহংকারের মাধ্যমে ।

অসুর বা শক্তির জাগরণ ভাল, কিন্তু শিব ছাড়া প্রকৃত মহাশক্তির প্রেমের জাগরণ হতে পারে না। শক্তি ছাড়া শিবের শবত্ব দূর করা সম্ভব নয়। তেমনি শক্তি ধ্বংসের বা সংহাররূপী। শিবের সঙ্গে মহামিলনে শক্তি শুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। শিব – শক্তি ছাড়া থাকলেই মৃতবৎ,তাই শিব শক্তি ছাড়া থাকেনা এবং শক্তিও শিব ছাড়া থাকলেই ধ্বংসোন্মুখ হয়। শক্তি শান্তি পেতে হলে শিবের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকতে হবে।

শিব ও শক্তিকে কেউ আলাদা বা খন্ড করতে পারবে না।

৬৩ ভারতের বাইরে মূর্ত্তিপূজা । ৫৫

ভারতে যখন কোন মূর্ত্তিরই প্রচলন ছিলনা, তখন আর্য্যরা প্রধান পূজারূপে অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ করতেন। প্রাচীন ভারতে আর্য্যদের পূর্ব্বে ষঠ্চক্রভেদ মুনি-ঋষিদের জ্ঞান ক্রিয়া ছিল। উপরন্তু, স্বাধ্যায়-রূপে বেদভ্যাস, বেদান্তেরও চর্চ্চা চলতো (বেদাচার)। বেদের পূর্ব্বেও — প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কুন্ডলিনী যোগের দ্বারা নিজেকে চেনা ও জানা ও শক্তির জাগরণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিজেকে চিনতে পারা বা নিজেকে জানতে পারার নামই ছিল আত্মজ্ঞান। প্রত্যেক মুনি-ঋষিগণই, নিজের দেহকে প্রাধান্য না দিয়ে আত্মাকেই প্রাধান্য দিতেন বেশী কারণ, আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু আর সকলই অনিত্য বস্তু।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-আহুতি, ধূপ-দীপাদির প্রচলন ছিল। আল্লায়াৎ এলউজ্জা, উদারেজ সাঙ্গা, মান্না প্রভৃতি দেব-দেবীর নামে পূজা হতো। আল্লা-তাল্লা-এলইলাহাত আরব,পারস্য দেশে ও তুরস্কতে,মুসলমান ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকাদের মূর্ত্তি তৈরী করে পূজা করতো। গ্রীস,রোম - প্রভৃতি দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে ওদের দেশের কবিদের কল্পনানুযায়ী দেব-দেবীদের ও অগ্নির পূজা করতো। দেব দেবীর নাম — মারকারী, নেমিসিস্, ভিনাস্ ,প্যান্ ,অ্যাপোলো ইত্যাদির ধাতব ও শিলামূর্ত্তির পূজা করতো। এট্লাস্ দেবতা পৃথিবীকে কাঁধে রাখতেন। পারস্যবাসীগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন ও যজ্ঞের প্রচলন ছিল। জড়থুষ্ট্র পার্সীজাতি তাঁদের শাস্ত্রানুযায়ী(জেন্দ-বেস্তা) এখনও শাস্ত্রাচারণ করছে।

সাধারন লোককে ভয় দেখাবার জন্য এরূপ দেব-দেবীর পূজার প্রবর্ত্তন। ক্ষুধার উদ্রেক হলে, খেলেই ক্ষুধা থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায় এবং আরও সুখাদ্য দিলেও খাওয়া সম্ভব হয় না, ভোজনেই শান্তি লাভ হয়। পুস্তক পাঠের দ্বারা বা ভ্রমনের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। ভোজনেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সেজন্য দ্বিতীয় লোকের সাক্ষী প্রয়োজন না। তৃষ্ণা পেলে জলই প্রয়োজন ভোজন করলে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না।

" ন হি জ্ঞানেন সদৃশঃ পবিত্রমিহ বিদ্যতে " — গীতা

২০১০